# উত্তরণ ও অন্যান্য গল্প

গোপাল রায়

প্রাপ্তিস্থান

প্রভা প্রকাশনী

আবাহনী
১১, নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া, নোনাচন্দনপুকুর
বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগণা

প্রকাশ :
অক্টোবর, ১৯৪২

প্রচ্ছদ :
রতন মুখার্জী

মুদ্রাকর :
বাসন্তী প্রেস
৩৭, বিডন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

## উৎসর্গ

কণা মাসী,

আপনার একাকীত্ব, সৃষ্টিশীল সত্তার বিকাশ
স্পন্দিত ক'রেছে নিত্য, এই তার নিয়ত প্রকাশ।

—কণা সেনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে

## লেখক এই সংগ্রন্থনার পাঠক হিসাবে

( ইংরেজী সংস্করণ থেকে )

"এই রচনাগুলি পড়ার সময় আমি কৌতূহলী হয়েছিলাম যে ক্যানো গ্রন্থকার ছোটো গল্প ও অণু উপন্যাসকে অ্যাকই সংগ্রহে স্থান দিয়েছেন। মনে হয়, উপন্যাসের (অণু উপন্যাসেরও) লক্ষণগুলি য্যামন সময়ের বিস্তৃতি চরিত্রের জটিলতা ইত্যাদি ছোটগল্পে ছ্যাখা যায়। আমাদের কালে এগুলি অপরিহার্য। আজকের চরিত্রগুলির জটিলতা ছ্যাখাতে হ'লে অপেক্ষকাকৃত প্রশস্ত জায়গার দরকার যাতে অ্যাকজন তাঁদের বিভিন্নভাবে দেখতে পারে। ছোটো গল্পের পরিসর তুলনায় অল্প ফলে চরিত্র অনেক সময় অ্যাকমাত্রিক স্তরে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। ইঁদুর দৌড়ের দিনে মানুষের সংক্ষিপ্ত অবসর উপন্যাসের স্বল্প পরিসর দাবী করে। এতে উপন্যাস ও ছোটো গল্প কাছাকাছি এসেছে। এদের অ্যাকই সংগ্রন্থনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

অনেক ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলির ভারতীয়ত্ব পরিস্ফুট হ'য়েছে। সম্ভবত 'চালওয়ালি'র গল্পে এটি সব থেকে স্পষ্ট। অধিকাংশ ছোটো গল্প ও অণু উপন্যাসে নারী অন্যতম ভূমিকা নিয়েছে কারণ স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশে নারী পুরুষ অপেক্ষা গত তিন বা চার দশকে নিজেদের বেশি বদলাতে পেরেছে। এই রচনাগুলিতে ছোটো পুঁজির ব্যবসায়ীদের প্রায়ই ছ্যাখা যায়। পশ্চিমবাংলায় বেকারির চূড়ান্ত বৃদ্ধি, চাষের খরচের ক্রমাগত বৃদ্ধি, নিম্ন ও নিম্ন-মধ্য আয়ের অনেকেই ব্যবসা করার প্রবৃত্তি দিয়েছে। এই সঙ্গে নিম্ন আয়কারীদের সামান্য আর্থিক উন্নতি বিশেষত আটের দশকে এদের ছোটো ব্যবসায় নামিয়েছে, যার ফলে প্রতিযোগিতা বেড়েছে।

বস্তির জীবনে সন্দেহের কিলিবিলির মধ্যে দুটি চরিত্রের অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্বের মধ্যে কখনো কখনো বিশ্বাস স্থান করে নেয়। 'উত্তরণ'-এ সেটি খুঁজবার চেষ্টা হ'য়েছে। বিশ্বনাথ এবং ভোলা—দুইই শিবের

নাম। বিশ্বনাথ ধ্রুপদী ধরণের শুনতে, ভোলা শব্দটি যেনো লোক-জীবনের অন্তর্গত। গল্পের শেষ দু'জন পরস্পরের সঙ্গে মেলে।

'স্বপনের ডাইরির সঙ্গে নির্মলার ভাবনার কোনো মিল নেই' এবং 'সম্পর্ক' গল্পে শহরে ও গ্রামের সম্পর্কের উপর আলোকপাত করা হ'য়েছে।

প্রথম গল্পটির শেষ পংক্তিতে (—মেলে না।—মেলে না।) কোনো কোনো পাঠক রবীন্দ্রনাথের দুটি গল্পের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। দুটি গল্পে একটি প্রাণবন্ত কিশোর অভিভাবকদের ক্রমাগত তাড়না এবং অবহেলায় অ্যাক সময় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। সে যেনো মৃত্যুর অতল গভীরত্ব মাপে,—এক বাঁও মে মেলে না।··· 'স্বপনের ডাইরির' গল্পে স্বপন মিত্র বেদনা ও হতাশায় সিদ্ধান্তে পৌঁছয় গ্রাম ও শহর কখনো মিলবে না। 'সম্পর্ক' গল্পে কোন স্তরে গ্রাম ও শহর মিলতে পারে সেটা ছাখানোর চেষ্টা রয়েছে।

'নিজের জগতে সুখলাল' গল্পটি সময় সময়ে শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতাল নামটি লেখকের মনে আলোড়ন তুলেছিলো। সুখলালের চরিত্রে নবীন প্রজন্মের যে আন্তর্জাতিক ঐক্য ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ বোধ না করা ও পোষাক ব্যবহারের ধরণে ছাখা যায় তা প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য সম্প্রতি পরিস্থিত পরিবর্তন ঘটেছে। লক্ষ্য করবার যে এখানে জীবনের প্রতীক নিজেই আহত।

'আলোমতি চন্দনপুর কথা' ও 'নবীনকৃষ্ণের দিনকাল' নামে অণু উপন্যাস দুটিতে ভারতীয় লোক ও ধ্রুপদী সংস্কৃতির নৈকট্য ছাখাবার চেষ্টা আছে। দুটির মধ্যে তফাৎ সৃষ্টি করার প্রবণতা সাংস্কৃতিক সংহতির বিরোধী। লেখককে জনৈক পাঠক জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'আলোমতি চন্দনপুর কথা' 'আধুনিক রামায়ণ কি না। এর উত্তর ছিলো,—'যদি তাই হয়, এ হলো রাম ছাড়া রামায়ণ। এইকাল মহাকাব্যিক বিশালতাকে মাত্র ছয়টি সংক্ষিপ্ত অংশ সমন্বিত ছোটো উপন্যাসে দাঁড় করিয়েছে। শুধু আধুনিক চিন্তাধারা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা

আমাদের গ্রামকে বদলাচ্ছে না, অনেক সময় অতিথিপরায়ণ, যা বিশেষভাবে ভারতীয়তা ও গ্রামগুলিকে বদলাতে সাহায্য করছে। সামাজিকতার এই চমৎকার ধারণা মধ্যযুগের জাতিভেদ প্রথাটি মলিন হয়েছিলো। এই ছোটো উপন্যাসে ১৯১০ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সময়কে ধরা হ'য়েছে, যখন দ্রুত পরিবর্তনশীল দেশ ও পৃথিবী একটি প্রত্যন্ত গ্রামের পরিবর্তন সাধন ক'রেছে।

'আপনি, তুমি, তুই' ও 'শচীন হালদার' গল্প দু'টি অন্তর্ভুক্ত করা হলো। কোনো কোনো রচনাকে কম বেশী পরিবর্তন করা হয়েছে।

'নবীনকৃষ্ণের দিনকাল'-এ নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষ্ণপদর আশা ও হতাশা ব্যক্ত হ'য়েছে। আমাদের গ্রামগুলিতে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাকরিজীবীর সংখ্যা বেড়েছে, আমরা এখানে প্রায়শ কৃষ্ণপদর মতো চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। নবীন বহু প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়। সে জয়ী না পরাজিত সেটা স্পষ্ট নয়। সন্দেহ নেই যে নবীন মেধাবী। বর্তমান পরিস্থিতিতে সে কদাচিৎই নিজেকে উন্নত করার সুযোগ পায়। সে সমস্ত বাঁধন ছিন্ন করে ও বাউল হয়। সে বৈচিত্র্যকে তথা বিভিন্ন মতকে মর্যাদা দেবার পক্ষপাতী যা ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য।

ভাষা ও ফর্ম নিয়ে মাথা ঘামান না এইরকম গ্রামের মানুষরা এই গল্প ও ছোটো উপন্যাসগুলি শুনতে সর্বদাই আগ্রহী ছিলেন। অ্যামন কী দরিদ্র, নিরক্ষর মেয়ে শুভঙ্করী ডোমনী গল্পগুলির জন্য বহু তথ্য সরবরাহ ক'রেছে বা ক'রতে আগ্রহী ছিলো। মহান ঔপন্যাসিক মুল্ক্ রাজ আনন্দকে এই গল্পগুলির পাঠক হিসাবে পাবার সুযোগ এসেছিলো। তিনি অনেকগুলি উৎসাহব্যঞ্জক পত্র দিয়েছেন—
'...Write about your village. Your autobiography —the story of an unknown villager beyond Nirod Choudhury...'( পত্র ২২-৯-১৯ )...'You may describe the work of a village Panchayet after land reform in West Bengal' ( পত্র ২৫-১২-১৯ )...'As you guess I am involved in the troubles in Punjab...For months I have not

thought of my writings or often people's work···you are young and naturally ardently creative. Do go on with your expressions'···( পত্র ৩-৫-১০ )। ভারতীয় সাহিত্যের দুই বরেণ্য ব্যক্তিত্ব নরেন্দরপাল সিং ও প্রভজ্যোৎকৌর গল্প-গুলির ইংরেজী সংস্করণ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। শ্রীমতী প্রভজ্যোৎকৌর ও শান্তনু উকিল এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। প্রথম জন শুরু থেকেই লেখককে আলোয় আনার চেষ্টা করেছেন ও দ্বিতীয়জন আলোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ও পিতৃসুলভ স্নেহে সব সময়ে প্রেরণা যুগিয়েছেন। গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘের দুর্গাপুর শাখার প্রাক্তন—সভাপতি ভক্তি ঠাকুর রচনাগুলিকে খুঁটিয়ে পড়ে ত্রুটি অ্যাড়াতে সাহায্য ক'রেছেন। অতি সাম্প্রতিক কালের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তরুণ রায়ের আশ্বাস গ্রন্থটির প্রকাশের কাজে বিশেষ সহায়ক হ'য়েছে। এই গল্পগুলি পূর্বে বসুধার', সুবর্ণরেখা, অনামী, শতদল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অমিত গুপ্তের 'বাঙলার লোকজীবনে বাউল' একটি সার্থক সহায়ক গ্রন্থ। সহকর্মী রাধাশ্যাম দাসের সহানুভূতি ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা স্মরণীয়। এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণ এঁদের স্মরণ ক'রবে।

সহকর্মী সন্তোষ ঘোষ, কাঞ্চন চ্যাটার্জী, শ্রীধর ঘোষ, প্রভাত সিংহ ও গৌতম ব্যানার্জীর সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতার কথা স্মরণ যোগ্য। তরুণ চিত্রপরিচালক কাজল চৌধুরী উত্তরণ গল্পটিকে দূরদর্শন-চিত্রে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

প্রকাশক বন্ধুবর অসীমকুমার মণ্ডল গ্রন্থটিকে প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন। এনাকে এবং প্রেস সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গোপাল রায়

# সূচীপত্র

গোপাল রায়ের পূর্ববর্তী সংকলন সম্পর্কে কয়েকটি মত ঃ—

লেখকের ওড়িয়াভাষী পাঠক আর. এম. পাত্র লেখেন ঃ

…'আমি আবিষ্কার ক'রে বিস্মিত হ'য়েছি যে আমাদের মধ্যে এখনও এমন বড়ো মাপের শিল্পী আছেন যিনি মনের গভীরতম কোণের বিরল আবেগ অনুভূতিগুলিকে এত উজ্জ্বল ভাষায় চিত্রিত ক'রতে পা'রেন ‥'

‥'এক সঙ্গে এতো ভালো লেখা। আপনি বিরামহীন ভাবে ভালো লেখেন কি করে?'

—অমিয় চক্রবর্তী

…'তাঁর Stream তাঁর শিক্ষিত কল্পনার স্বতস্ফূর্ত বিন্দুতে পূর্ণ… কবি দক্ষতার সঙ্গে তাঁর মাধ্যমকে জীবনের বৈচিত্র্যগুলি আমাদের দেখাবার জন্য ব্যবহার করেছেন বিকৃতিগুলিকে নয়…পৃথিবীতে সুরের রকমফের এবং ছন্দ সব সময়ে আছে 'Stream of Stream's তাই নির্দেশ করছে…'

—সি. বাসুদের রাও

( দিল্লির বাইওয়ার্ড ও শ্রীকাকুলামের -
মহোদয় পত্রিকা থেকে )

# উত্তরণ

বিশ্বনাথকে চেনো তো? ওর সঙ্গে আমার পরিচয়ের পিছনে অ্যাক কাহিনী আছে। সে সময়ে ও নোতুন এসেছিলো ওই তল্লাটে। অনেকের মুখে শুনতাম ওর কথা। ছেলেটা ক্যামন যেনো মিশুকে নয়,—অন্তত ওর সম্পর্কে কারো কারো মত তাই ছিলো। রেললাইন ধরে সকালে নাইট-ডিউটি সেরে ফিরতাম, ও আসতো বিপরীত দিক থেকে। কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা কাজে চলে যেতো। আমি অ্যাক নজর দেখে নিতাম ওকে। পরনে আটপৌরে পায়জামা, গায়ে স্ট্রাইপ দেওয়া মান্ধাতার আমলের শার্ট, পায়ে শস্তা পলিথিনের চটি, চেহারা অতি সাধারণ কিন্তু অ্যাকটা মায়া জড়ানো ভাব ওর সমস্ত অবয়বে আছে। সেটা ঠিক কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের জন্য, বলা মুসকিল। আশেপাশের আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারতাম না ওকে, এই ছিলো আমার কৌতূহলের কারণ। না হলে এই বিরাট শহরে কে কার খোঁজ রাখে।

আমার বাড়িও কোলকাতা শহরে নয়। পেটের তাগিদে আট দশ বছর ধরে পড়ে ছিলাম এখানে। থাকতাম মাসিক কুড়ি টাকা ভাড়ার বস্তিতে, বিশ্বনাথেরই ঘরের কাছে। নাইট-গার্ডের কাজ ক'রতাম এ্যাকটা অফিসে, তা-ও সরকারি নয়। ফলে সুবিধে হতো, অসুবিধে তার থেকে বেশি। রান্না আর টুকিটাকি কাজ নিজেকেই করতে হতো, গল্প-গুজব করার সময় বড়ো অ্যাকটা পেতাম না। নিতান্ত দরকার হলে ছুটি পেতাম কর্তাদের দয়ায়, তখন বাড়ি যেতে হতো। সেদিকেও দ্যাখাশুনো করার কেউ ছিলো না।

২

সেবার শরীর বেশ খারাপ, দু'দিনের ছুটি পেয়েছি। রান্নার বালাই ছিলো না, অসুখের সময় ভাত খাওয়া ঠিক নয়। ডাক্তারের

ধার বড়ো ধারতাম না। ধারবার মতো পয়সা আমার ছিলো না। আমার মতো মানুষের পক্ষে কয়েকদিনের চালের খরচ বেঁচে যাওয়া অ্যাকটা বিশেষ ব্যাপার। মুসকিল এই যে চুপচাপ বসে থাকতে হতো। ব্যস্ত-সমস্ত মানুষ আমি, একটু বসতে পেলে ভালো। তা বলে অফুরন্ত সময় পাওয়াটা যে কি রকম, হাড়ে হাড়ে বুঝেছি তখন। অ্যাকে গা ম্যাজ-ম্যাজ, তার উপর শীতের সকাল, স্যাঁতসেঁতে ঘরে বসে থাকা গ্যালো না। অ্যাকটা মোড়া নিয়ে বাইরে সকালের রোদে বসলাম, পাশের ঘরের হরিহরদার ছাখা পাওয়া গ্যালো। বিড়ি বাঁধার সরঞ্জাম, কুলো তামাক পাতা নিয়ে তিনি বসলেন রোদে।

বস্তির সারি সারি ঘর দু'ধারে, মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গা: অ্যাকপাশে রেলের প্যাঁচিলের গায়ে অ্যাকটা জামগাছ। এখানে গ্রাম-ছাড়া, বস্তিবাসী বাঙালি তাদের আড্ডা দেওয়ার অভ্যাসটা আজও টিকিয়ে রেখেছে কায়ক্লেশে।

হরিহরদা প্রথমে শুরু করলেন; 'কি গো, শরীর খারাপ মনে হচ্ছে।' আমার অলস ভাব খানিকটা কাটলো। 'হ্যাঁ, শরীর খারাপ, দু'দিনের ছুটি নিয়েছি' বলে হরিহরদার দিকে ঘুরে ব'সলাম। উনি বয়স্ক মানুষ তার অভিজ্ঞ, ওঁর গল্প শুনে সময় কাটবে ভালো। 'ঠাণ্ডা লেগেছে দেখছি। অ্যাকে শীতকাল তার উপর ঘরের যা অবস্থা! তা বাবা, একটু তুলসির পাতা মধু দিয়ে খেয়ো। ক'দিন খেলে ঠিক হয়ে যাবে'। হরিহরদা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ডাক্তারি করলেন, নিজের ঘরের কথাও ব'লে নিলেন। তাঁর কল্যাণে আমার তুলসি পাতার অভাব হ'তো না কোলকাতা শহরেও। তিনি অভাবের তাড়নায় শহরে এসেছেন যৌবনে, কিন্তু গ্রামের অভ্যাসগুলো ছাড়তে পারেন নি। বুড়ো বয়সে সেগুলো আঁকড়িয়ে ধরেছিলেন আরো—প্রমাণ ঘরের সামনের তুলসি মঞ্চটি। এর কয়েক বছর আগে মেয়েকে দিয়ে অনেক ব'লে করে তৈরি করিয়েছিলেন। হাত চলছিলো হরিহরদার, সঙ্গে চালাছিলেন নানা সুখ-দুঃখের কথা। ইতিমধ্যে তিনি ঘরের ভিতর গেলেন কি দরকারে,

আমেজে আমি চোখ বুঝলাম।

হঠাৎ ঝগড়াঝাঁটি শুনে ঝিমুনি কেটে গ্যালো। ঠিক ঝগড়া নয়; আমার পিছনে রেলের পাঁচিলের ওধারে লাইনের উপরে হল্লা হচ্ছিলো। হরিহরদা কাজে বসবার জন্য বেরিয়ে আসছিলেন। হামলা হুজুত লেগেই আছে। দেখি কি হ'লো—ব'লে এগিয়ে গেলেন, পাঁচিলের গায়ে ভাঙ্গা জায়গাটা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিলেন। দ্যাখাদেখি আমিও উঠলাম। ভাঙ্গা জায়গা দিয়ে দেখি ছোটোখাটো জটলা। অ্যাকটা বাঁক নামানো রয়েছে—দুটো ভাঁড় তাতে। ভোলা মস্তানের ভঙ্গিতে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথকে কি বলছিলো। তাদের ঘিরে ইঁচড়ে পাকা ছোটো ছেলেগুলোর হইচই—নানা বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করছে বিশে অর্থাৎ বিশ্বনাথকে। বস্তির কয়েকটা ছোটো মেয়ে ঘুঁটে দেবার জন্য রেলের পাঁচিলের কাছে গোবর জড়ো করছিলো। তারা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি শুরু করলো। দু'অ্যাকটা কথা কানে এলো। 'শ্লা, রাস্তা দেখে চলতে পারিস না'—ভোলা বলছে। হইচই-এ অপর পক্ষের কথা শুনতে পাওয়া গ্যালো না।

অনেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিলো। নিরীহ ছেলেটার এরকম হেনস্তা আমার সহ্য হচ্ছিলো না। হরিহরদাকে কিছু বলার আগেই তিনি এগিয়ে গিয়েছেন; 'কি হলো রে? গোবেচারাকে উৎপাত করলে সবাই।' পাঁচিলের গায়ে গোবর চাপড়া দিচ্ছিলো গোবরার মা, দু'পা এগিয়ে গিয়ে ভোলাকে বললো,—'এই ছ্যোকরা, খুব নাম্বা নাম্বা কতা বলতেছিস, আগে থাকতে বলতে হয়। নিজে ধাক্কা দে তারপর চ্যাটাং চ্যাটাং কতা।' ট্যাক্সি ড্রাইভার পাঁড়েজী আসছিলেন। ভোলাকে বললেন,—'দেখো তো ভাই, গলত তোম্‌হার আছে।' ভোলা জবাব দিলো গোবরার মা'র দিকে তাকিয়ে,—'তুমি বাতেলা মারতে এসো না। আমার মাল ওর গায়ে লেগে পড়েছে, পয়সা ফেলে যেতে হবে, সাফ বাত।' শেষকালে কয়েকজন স্থানীয় মস্তান আসলো। 'কি হলো বে ভোলা'? বলে ওরা এগিয়ে আসতে সবাই চুপ মেরে গ্যালো।

যে যার নিজের কাজে এগোলো যেনো কেউই ব্যাপারটা জানে না।
হরিহরদাও থামলেন। এদের না ঘাটানো ভালো। ছোরা, বোমা
নিয়ে এদের কারবার। ভোলাও ওদের সামনে মিঁটিয়ে রইলো।
ছোটো ছেলেদের হু'অ্যাকজন হই হই করে কি ঘটেছিলো বলতে শুরু
করতেই ওদের অ্যাকজন ধমকে থামিয়ে দিলো। ভোলাকে সব বলতে
হ'লো। গোবরার মাও বললো। ফয়সালা অ্যাকটা হলো। বিশ্বনাথ
ভোলাকে ছ'টাকা দেবে বাকিটা ভোলার পকেট থেকে যাবে। দু'
কেজি ওজনের অ্যাকটা দুই-এর ভাঁড় ভেঙে গিয়েছে—দাম কুড়ি টাকা।
পরের মাসে মাইনে পেয়ে বিশ্বনাথ ছ' টাকা দিয়েছিলো ভোলাকে।

ব্যাপারটা জানা গ্যালো প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে। বিশ্বনাথ
যাচ্ছিলো তার পিছনে দই-এর বাঁক কাঁধে যাচ্ছিলো ভোলো—শ্রাদ্ধের
অর্ডার। ও বিশ্বনাথের ঠিক পিছনে পৌঁছেই 'সাইড দে, সাইড দে'
বলে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলো। বিশ্বনাথ চমকে সাইড দিতে গিয়ে ধাক্কা
লেগেছিলো। লাইনের উপর দিয়ে যাচ্ছিলো বলে ভোলা টাল
সামলাতে পারেনি, না হ'লে এ রকম হতো না।

বিশ্বনাথদের গ্রামেই ভোলাদের বাড়ি। শুনেছে সেটা আর
বাড়ি নেই, বাঁশের খুঁটি আর মাটির দেওয়ালের কঙ্কাল কাঠা দেড়েক
জমির উপর দাঁড়িয়ে ছিলো। ও কাকার বাড়িতে মানুষ। ওর বাবা-
মা খুব গরিব। জায়গাটা ওরা ভোলার কাকার কাছে বাঁধা দিয়ে-
ছিলো। লেখাপড়া কোনো রকমে ক্লাস টু, তারপর রণে ভঙ্গ দিয়ে-
ছিলো ও। কোলকাতায় চাল, কাঁচা-আনাজের কারবার করতো,
বাবুদের বাড়িতে নানা কাজ করেও কিছু টাকা কামাতো। চা,
বিড়ি আর মাঝে মাঝে সিনেমা—এছাড়া আর কোনো নেশা ছিলো
না। লোকে বলতো, ওর কিছু টাকা আছে। মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে
ও আম-জাম পেয়ারা সদ্‌গতি করতো। ওদের জমিটায় বেশ কয়েকটা
জাম আর পেয়ারার গাছ হয়েছিলো। ভোলার ইচ্ছে টাকা জমিয়ে
কাকার হাত থেকে ও ভিটেটা উদ্ধার করবে।

একটু পরে যে যার কাজে চ'লে গ্যালো, হরিহরদাও এসে বসলেন। গোলমালে কার পায়ের ধাক্কায় ওঁর কুলোটা উ'ল্টিয়ে গিয়েছিলো অ্যাকবার ধারে রাখা সত্বেও। কুড়োছিলেন আর গজগজ করছিলেন,—'আরে বাপু ঝামালা বাধাবি তোরা ইদিকে, ভুগবো আমি। আমি মোড়ায় এসে বসেছিলাম, বললাম,—'দেখুন দেখিনি, কী কাণ্ড !

হরিহরদা হাত চালাতে চালাতে আবার শুরু করলেন,—'বিশের বাপ ধীরে ভালো ছেলে ছেলো। পয়সা-কড়ি, জমি-জমা, কিছুতেই কমতি ছেলো না ওদের। তার জন্যে ধীরেটার অ্যাতো টুকুন দেমাক ছেলো না। বই সেলেট নে যেতাম ওদের বাড়ির সামনের রাস্তাটাতে —ডাকতাম—ধীরে। ধীরে গুটিগুটি বেইর‍্যে আসতো বই, সেলেট হাতে। আমাদের কেলাসে ও পড়তো। ও ছেলো গোবেচারা। আমাদের মতোন চালাকি জানতো না। আমরা আম, জাম, প্যায়রা পেড়ে নে ওকে ভাগ দেতাম। ও সক্কলের সামনে খেতো। বাগানের মালিক ধরতো ওকে। আমরা তো ওঁচা। ওর মাথা ছেলো সাফ। মাস্টার মশয় আঁক কষতে দেতেন, ও চোক্ষের নিমেষে ক'রে দেতো—আমরা তো হাঁ।'

'তারপর কোথা থেকে কি হয়ে গ্যালো—আমি পেটের তাড়ায় এলাম শহরে। ধীরে লেখা-পড়ায় ভালো ছেলো বটে, গতরে খাটতে পারতো না। আজকাল শুধু লেখাপড়ায় কি হবে। সুযোগ বুঝে আত্মীয়-কুটুম্বরা লুটে পুটে খেলে। ধীরে কিছুদিন এধার-ওধার ক'রে বদসঙ্গে পড়ে গ্যালো। মদ-গাঁজা খে' ওড়ালে। ধীরের মা ভাবলে, বে' দে দিলে ঠিক হ'য়ে যাবে। ওর সংসারে মন বসবে। এর পর বিশে হ'লো। ধীরে মদ-গাঁজা ছাড়লে বটে, কিন্তু কি রকম হয়ে গ্যালো। বিশে নেতান্ত ভালো ছেলে, তাই ম্যাট্রিক পাশ করলে। তারপর খাটতে এলো কোলকাতায়। সংসারের নেত্য অশান্তি থিকে দূরে গে বাঁচলে। তবে হ্যাঁ, বিশের মা ছেলো শান্ত। হলেই বা। ও কতো সইবে।' হরিহরদা অ্যাকটানা বলে দম দিলেন।

এর আগে বিশ্বনাথের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো। বেশ ক'বার কথাও বলেছি ওর সাথে। যাই হোক. অ্যাতো জানতাম না! নিজের সম্বন্ধে ও কিছুই বলে নি। ভেবেছিলাম ওর ভিতরে নিশ্চয় কিছু রহস্য আছে।

৩

মাস পাঁচেক পরের কথা। সেদিন বেশ গরম প'ড়েছিলো আর কি অ্যাকটা কারণে অফিস ছুটি হ'য়ে গিয়েছিলো। এর মাসখানেক আগে আমি অনেক ব'লে ক'য়ে নাইট-ডিউটির বদলে ডে-ডিউটি নিয়েছি। মাইনের অবশ্য ইতর বিশেষ নেই। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ দিন আর রাতের তফাৎ দেখতে পান না। তবে ছুটিটা সহজে পাওয়া যায়। টুকিটাকি কয়েকটা কাজ সেরে তুপুর বারোটার ট্রেন ধরেছিলাম বাড়ি যাবো বলে। পরের দিন রবিবার—ছুটি। তু'টোর ট্রেনে শনিবারের অফিস-প্যাসেঞ্জারের ভিড় হবে, দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি বারোটার ট্রেন ধরেছি ওইজন্য।

ট্রেনটা ফাঁকা ছিলো। বসার জায়গা না থাক, দাঁড়ানোর জায়গা ছিলো। কারেন্ট ছিলো না—না কি, ট্রেন নড়তে চায় না। খানিকটা বিরক্ত বোধ ক'রলাম। তাড়াতাড়ি এসে বসার জায়গা পেয়েছি, কিন্তু ট্রেন যতো দাঁড়াবে, ততো ভিড় বাড়বে। অ্যাকসময় দেখলাম, বিশ্বনাথ কামরায় উঠছে। সময় কাটবে মনে ক'রে তাড়াতাড়ি ডাকলাম, —'বিশ্বনাথ, এদিকে।' ও আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো। আমি পাশের লোককে একটু চেপে ব'সতে ব'ললাম এবং বিশ্বনাথকে জায়গাটা দ্যাখালাম। ওর মুখে চোখে অ্যাকটা খুশি ভাব মুহূর্তের জন্য ফুটলো। আমি কিছু জিগগ্যেস করার আগেই ও জিগগ্যেস করলো—'বাড়ি যাচ্ছেন?' উত্তর দিয়েছিলাম,—'হ্যাঁ, তুমি?' ও বললো,—'আমিও।' বাড়িতে মা-র অসুখ। খবর পেলাম। ওর মুখে তুশ্চিন্তার ছায়া প'ড়লো। ভোলার কথা উঠতেই বললো,—'আমাকে সেদিন বিনা

দোষে গাল দিলো। 'ছোটোলোক ভদ্রলোক আর গায়ে লেখা থাকে না',—ব'লেই অন্য কথায় গ্যালো। 'শঙ্করদা আমি আপনার কথা শুনেছি। হরিহর কাকা ব'লছিলেন।' ও একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে, তারপর আবার শুরু ক'রলো,—'জানেন, দিলীপ ব'লে আমার অ্যাক বন্ধু ছিলো। আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার মশাই-এর ছেলে। সব কিছুতেই ওর সঙ্গে আমার তর্ক হতো—য্যামন পরীক্ষার ব্যাপারে। আমি ওর থেকে ভালো রেজাল্ট করি। মাধ্যমিকে ও পেলো ফাস্ট ডিভিসন। কোনো রকমে সেকেণ্ড ডিভিসন পেলাম আমি। হেরে গেলাম। আমি আশা ছাড়ি নি।' ও এই কথা ব'লছে অথচ গলার স্বরে উত্তেজনা ক্যানো নেই বুঝতে পারছিলাম না।

'শঙ্করদা, আমার মালিক ভালো নয়। এখানে কাজ ক'রতে ভালো লাগছে না। কাজ তো না, মালিকের গাল খাওয়া। সুযোগ পেলে একাজ ছেড়ে দেবো।'···ব'লে চলেছিলো বিশ্বনাথ। ওর কথার মাঝখানে বলেছিলাম,—'কি আর করবে বলো, গরিব মানুষের উপায় নেই। কে চায় গাল খেতে '

ছেলেটা সহজে সব কথা বলে গ্যালো। ওর জেদবাজি আছে। এর থেকে আমাকে সাবধান হতে হবে, আমি ভেবেছিলাম। চাকরির যা বাহার। আমাকে চাকরি করে খেতে হ'তো। আমিও বাইরে থেকে এসেছিলাম।

বিশ্বনাথ পনর-কুড়ি দিন পর কোলকাতায় ফিরেছিলো। দ্যাখা হ'তে জিগগ্যেস ক'রেছিলাম,—'তোমার মা ক্যামন আছেন?' ও জবাব দিয়েছিলো,—'ভালো।' বললাম,—'তোমার চেহারা একটু খারাপ লাগছে।' নিজেকে অ্যাকবার দেখে নিয়ে ও ব'ললো,—'তা হবে।' কিছুক্ষণ কথা বলার পর ও ব'লেছিলো,—'ভোলার জন্যে মা তাড়াতাড়ি সারলো।' আমি বাড়ি যাবার দু'তিন দিন পর ভোলা ওখানে গিয়েছিলো। হঠাৎ আমাদের বাড়িতে হাজির। অনেক জাম পেড়ে নিয়ে চিবোতে চিবোতে ও মা-র কাছে বসলো। মা জিগগ্যেস

করলো,—'ভোলা ক্যামন আছিস ?' ভোলা বললো,—'ভালোই আছি মাসীমা। তোমাকে দেখতে এলাম।' মা বললো,—'এই দ্যাখ বাবা, অসুখ হ'য়ে গ্যালো। ঘরে নাই অ্যাকটা পয়সা।' সত্যিই আমার হাতে তখন পয়সা ছিলো না। ভোলা কিছুক্ষণ নিচের দিকে চেয়ে পা দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে বিশ্বনাথকে ডেকেছিলো,—'এই শোন।' ওর হাতে দু'শ টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলো,—'হারু বৌদির কাছে পেলাম। আমার কাছে থাকলে খরচা হ'য়ে যাবে।' বিশ্বনাথকে ইতস্তত করতে দেখে ও বললো,—'আমারও মা আছে। ভাবিস না। আ বে, তোর কাছে সুদ লোবো না, লে হলো ?'

ভোলারা শুধু গরিব ছিলো না। ওর মা প্রায়ই অসুখে ভুগতো। কাকার বাড়িতে আদর-যত্ন পেতো না। ও বিশ্বনাথের মায়ের কাছে আসতো, ছোটোতো ওর মাকে মা বলতো। বিশ্বনাথের মা ওকে শিখিয়ে নিয়েছিলো যেনো ওর কাকার বাড়িতে কেউ না জানতে পারে।

ছোটোতেই ভোলার বুদ্ধি হয়েছিলো, ওতো খারাপ অবস্থার মধ্যে মানুষ। অ্যাকদিন বিশ্বনাথের মা ওকে তার মা-র জন্যে বলেছিলো ও কেঁদে ফেলেছিলো। তখন ওর মা-র খুব অসুখ। বিশ্বনাথের মা ওকে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলো,—'কাঁদছিস ক্যানো ? আমি তো আছি।'

আমি বলেছিলাম,—'অ্যাকদিন যে ওকে ছোটোলোক বলেছিলে।' বিশ্বনাথ বললো,—'ভোলা আমাকে শিক্ষা দিলো। ও ছোটোলোক, কিন্তু ভদ্রলোকের থেকে ভালো।' হঠাৎ যেনো ও উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বললো,—'শঙ্করদা কারবারে নামছি ভোলার সাথে।' বলেছিলাম,— 'সে কি ? তুমি পারবে ? যা কম্‌পিটিশন। কাঁচামালে দাঁড়িমারা আছে। লাভ যখন হবে—হবে, ডোবাবে তো সব ডোবাবে।' বিশ্বনাথ বললো,—'অন্য সকলে বিশ টাকা লাভ ক'রবে, আমরা না হয় দশই করবো।' কাঁচামালের কারবার, দু'জনে জমবে ভালো। ভোলার এই লাইনে আইডিয়া আছে। তাছাড়া নিজের স্বাধীন জিনিস !

আমার নিজেকে ছোটো মনে হলো ওকে অবিশ্বাস করেছিলাম। বস্তির জীবনটা আমাকে যেনো কি করে দিয়েছে।

# চালওয়ালি

সকালের দিকে যে গোটাদশেক টাকার বিক্রি হলো, সেই শেষ। পাড়ার মুখো বাবুদেরও যেনো খোল খাঁকতি হয়ে গেছে। দশটা বাজলো কি না বাজলো, আকাশের দিকে আর চাওয়া যায় না। আগুন ঢেলে দিচ্ছে অ্যাকেবারে। রাস্তা খাঁ খাঁ, মানুষজন দু'-অ্যাকটা চলে কি না চলে, তরকারিওয়ালাদের ফেলে যাওয়া শুকনো শাকসব্জীর পাতা ইতস্তত ছড়ানো, উত্তপ্ত ধুলোবালির সাথে পড়ে আছে বিমলার মতো দু' অ্যাকজন ফুটপাত ব্যবসায়ী হতভাগী। মাথার উপর ভাঙা ছাতা অ্যাকটা আছে বটে, সেটা রোদ আড়াল করার চাইতে বরং চোরা পথ দিয়ে তার ঢোকার রাস্তা তৈরি করে ছায়। রঘুটাও এদিকে কান্না জুড়লো। সামনের চালের স্তূপের দিকে তাকিয়ে বিমলার মাথাটা ক্যামন ঘুরে যায়। ওইভাবে অ্যাকটানা বসে, তার উপর সামনে ভাসে মহাজনের নাকে চশমাওয়ালা তিড়িক্কে মুখ আর লালসা-ভরা চোখগুলো ও ব্যালায় টাকার বুঝ দিতে হবে তাকে, এদিকে মাল রইলো পড়ে। শেষবারের মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে বিমলা চাল ভরে ফেললো বস্তায়; গলার স্বর একটু উঁচুতে তুলে ডাকলো জয়ার মাকে,—'এই দিদি, একটু ধরে দে না।' শেষে বড়ো ছেলে দশ বছুরে মঙ্গলের হাতে রঘুকে আর ছাতাটাকে দিয়ে বস্তা মাথায় করে বিমলা রওনা দিলো ঘরের দিকে।

বছর খানেক আগে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে চুনোখালির লাট থেকে রঘু-মঙ্গলকে নিয়ে বিমলা এসেছে এখানে। অর্থাৎ বালিগঞ্জ-কসবার বস্তিতে। নিজেদের কিভাবে চলবে. তাদের বা কি খাওয়াবে পরাবে এইসব ভাবতে ভাবতে চলতে চলতে দূর থেকে কানে এলো, মদের ঘোরে এলোপাথাড়ি গাল দিয়ে চলেছে রঘুর বাপ,—'এই শালী, দে—এক্ষুনি ফ্যাল আমার দু'কুড়ি দশ টাকা। দপ করে আগুন জ্বলে

ওঠে বিমলার মাথায় চাপা আক্রোশে ওখান থেকেই শুরু করে—, ‘ঢ্যামনের ব্যাটা ঢ্যামন কোনকালে কি দিছিস তার অ্যাতো চোট ? খাওয়াবিনি, পরাবিনি তো বে করেছিলি কি ক’ত্তে ?’ চালের বস্তা জরাজীর্ণ দরজার সামনে নামানোর আগেই রঘুর বাপের চোখ পড়ে তার দিকে,—‘এই শালী চোরের জাত, গ্যালো আষাঢ় থেকে এ বছরের বোশেখ—অ্যাগারো মাসের সুদ আসল এক্ষুনি ফ্যাল।’ রাগে মুখ থেকে কথা বেরোয় না বিমলার, লেগে যায় মারামারি। কান্নাকাটি শুরু করে মঙ্গল,—‘এ বাবা আর মারিস নি।’ রঘু গলা মেলায় এর সাথে।

রঘু-মঙ্গলকে আনার কিছুদিন পর থেকে নিষ্কর্মা রয়েছে রঘুর বাপ। লোকে বলে তার অসুখ, তাকে দেখেও তাই মনে হয়। সুস্থ যখন ছিলো তখনও রোজগারের প্রায় সবটারই মদ গিলে পড়ে থাকতো এখানে ওখানে। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে বিমলা তাকে চাল নিয়ে বসিয়ে দিতো কসবা বাজারের কাছে, লাভের ভাগও যে দিতো না, তা নয়! রাত আটটা কি সাড়ে আটটা, তারপর ঘরে ফিরলেই ধুন্ধুমার লেগে যেতো,—‘এই, পাক্কা আশি কিলো মাল ছেলো, নিজেরা মাথায় ক’রে টেনে এনেচি মথরাপুর থেকে। চার টাকা ক’রে বেচলেও তিনশ’ কুড়ি টাকা। বার কর ওলাওঠো, বার কর।’ রঘুর বাপও কম যেতো না,—‘লাগাবিনি অ্যাকদম। শোরের জাত, তোর বাবার পয়সায় খাই ? মাল মেপে দে যাবি, দর বলে দে যাবি, তার অ্যাক পয়সা কমে বেচবো নি। তারপর মাল পড়ে থাকে—থাকবে।’ বিমলা রুখে ওঠে,—অ্যাঁ-অ্যাঁ—। ন্যাকা! নব্বুই-এ কেনা আছে, পুলিশের হপ্তা আছে, মাল চোট যাওয়া আছে, তারপর দশটা পয়সা লাভ রাখবি নি।’ রঘুর বাপের জবাব,—‘তোর মাল, তুই বুঝে করবি।’ ‘যা ওলাওঠো, তোকে বেচতে হবে নি’—বিমলার উত্তর। সেই থেকে রঘুর বাপ আরো লাগাম ছাড়া।

বিমলা অ্যাকটা ঘরের আড়ালে গিয়ে বসে। উত্তেজনা কমেছে,

সে এবার ক্লান্তি অনুভব করে। রাঁধা বাড়ার ইচ্ছে মরে গেছে। ঘরের দিক থেকে সাড়াশব্দ আসে না। কাঁদতে কাঁদতে রঘুটা বুঝি ঘুমিয়ে পড়লো। তার চোখ পড়লো রঘুর বাপের দিকে। নেশার ঘোরে পড়ে রয়েছে দরমার বেড়ার কাছে জড়ো করা অ্যাকরাশ ধুলো-বালি ময়লার উপরে। মুখে আর রুক্ষ খালি গায়ের উপরে নিষ্করুণ রোদ।

জয়ার মা কাপড়-চোপড় হাতে দাঁত মাজতে মাজতে চলছিলো পুকুর ঘাটের দিকে, বিমলাকে ডাকে—'এই বিমলি, চান করবি নি?' বিমলা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, উঠে কাপড়-চোপড় নিয়ে আসে, কি মনে করে নেয় বালতিটাও, রওনা ছায় তার পিছনে পিছনে। জয়ার মা একটু মজা ছাখার উদ্দেশ্যে বলে, 'কিরে বিমলি, চুপ মেরে গেলি যে?' ওই অ্যাকটা ফুলকিই তখন বারুদে আগুন লাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। বিমলা ফেটে পড়ে,—'বন শোরের জাত, হাড় জ্বালানেটা রেলে কাটা পড়ে মরে না ক্যানো? সারাটা জেবন একটু শান্তি দেলে না রে।' জয়ার মা'র মজা ছাখার ইচ্ছেটা বেড়ে যায়,—'লক্ষ্মীছাড়ি! তুই দে দিলে পারিস অমন পঞ্চাশ টাকা। আমি হলে মুখির উপর ছুঁড়ে ফেলে দে কতা কতাম!' বিমলা বলে,—'ক্যামন মদো মাতাল দেখতিছিস না? পঞ্চাশটা টাকা সেদিন কোঁচার খুঁটে বাঁধা দেখে নে নিছিলাম খুব ভাগ্যি, নয়তো কে নে নিতো, কোথায় ফেলতো—হাতে থাকলো, গিলে বসে থাকলো।' আসলে টাকাটা বিমলার চোখে পড়েছিলো দরকারের সময়ে। ও গা বাঁচাবার চেষ্টা করে,—'অমন বুড়ো মদ্দ'কে আমিও অ্যাকটা বছর ধ'রে টানতিছি, তার হিসেব কর। ওর চিকিচ্ছের খরচ যোগায় কে?' বিমলা মাস দুয়েক আগে অ্যাক বোতল টনিক নিয়ে এসেছিলো কার মুখ থেকে সেটার নাম শুনে, বোধহয় লিখিয়েও নিয়েছিলো তার কাছে।

ঘাট থেকে বিমলা গেল বেশ দেরি করে ফিরেছিলো, জয়ার মা আগেই ফিরেছে 'ক্যাস ট্রেন' ধরবে বলে। বিমলার ট্রেন ধরার তাড়া

নেই, আড়তদারের কাছে মুখ গ্যাখাবে কি নিয়ে? তা ছাড়া ঘাটেও ছিলো বেশ ভিড়। ঘরের কাছে এসে বুকটা ধক করে উঠলো তার। দরজা হাট করে খোলা। রঘুর বাপ নেই। তবে—না, ভগবান কি তার অ্যাগে বুড়ো সর্বনাশ করবেন? বোধহয় মুখে খুব রোদ লেগেছে, উঠে গিয়েছে রঘুর বাপ।

ভিতরে ঢুকতেই—আরে! খাটিয়ার কোণে রাখা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোর বোঝাটা কেউ নাড়াচাড়া করেছে বলে মনে হচ্ছে। সরিয়ে গ্যাখে সর্বনাশ তার হয়েছে—চাল বেচা দশটা টাকা নেই, বিশ টাকা যে ধার নিয়েছিলো, তা-ও নেই। ইদানীং টাকা-পয়সা সে ওখানেই সরিয়ে রাখতো, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়া ছাড়া তার আর কিছু করার ছিলো না।

সম্বিত ফিরলো পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পায়ের শব্দে। বস্তা হাতে জয়ার মা চলেছে। রোজই সে বিমলাকে ডাকে, আজ হাবে-ভাবে সব বুঝে ডাকে নি। হাউ-হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আর কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বিমলা তাকে বলে,—'দিদি রে. মুখপোড়া আমার সর্ব্বোনাশ করে দে গ্যালো। আমার তিরিশ তিরিশটা টাকা! পোড়ারমুখো আসুক, ওকে আজ শেষ করবো, না হয় আমিই যাবো। জয়ার মা তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলো। রোদ পৌছে গেছে রেলের পাঁচিলের গায়ে ইটের খাঁজটার কাছাকাছি, অ্যাখনি ট্রেন আসবে। সে অস্ফুটে বলতে বলতে এগিয়ে গ্যালো,—'অ্যামন কপাল করে এইছিলি! কর যা ভালো বুঝিস—তাই কর।' আশপাশ থেকে নানা বয়সের কয়েকটি মুখ ইতঃস্তত গ্যাখা গ্যালো ও সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাটা ছেঁড়া মন্তব্য।

ইতিমধ্যে মঙ্গল এসে দাঁড়ায় গা-মাথা ভর্তি নোংরা নিয়ে,—'মা-গো, খেতে দে।' মুহূর্তের মধ্যে বিমলের কোথায় যেনো কি হ'য়ে গ্যালো,—'ওলাওঠোর ব্যাটা ওলাওঠো চ্যায়রার ছিরি গ্যাখো, যেনো খানা থেকে উঠে এয়েছে বলেই অ্যাকটা কাঠের পিঁড়ি ছুড়ে গ্যায় তার দিকে। 'মা গো' বলেই চিৎকার দিয়ে মঙ্গল পড়ে যায় দরজার মুখে। 'হায় হায়

ছেলেটাকে মেরে ফেলিছি রে'—ব'লে কেঁদে উঠে বিমলা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। চান করার সময়ে খাওয়ার জল এনে রেখে ছিলো—মঙ্গলকে ঘরের পাশের নালিটায় কাছে নিয়ে গিয়ে মাথায় সেটা ঢেনে সুস্থ ক'রে তোলার চেষ্টা করে। নড়বড়ে খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে বিমলা অ্যাকবার নোংরা ছেলেটার দিকে তাকালো, মায়া হ'লো তার। মঙ্গলের উপর ঝুঁকে পড়ে বলে'—'কোথায় লেগেছে রে বাপ?' মঙ্গল হাত দিয়ে ছাখার পিঠের দিকে। পিঠে মালিশ ক'রে দিতে দিতে বিমলা বলে,—'হাঁড়িতে পান্তা আছে, খেয়ে নিস,' ও শুয়ে পড়ে। মঙ্গল কিছুক্ষণ বাদে উঠে খায়, মাকে জিগগ্যেস করে,—'মা তুই খাবি নি?' বিমলা 'না রে, খিদে নেই'—বলে পাশ ফিরে শোয়। মঙ্গল থালা ছেড়ে ওঠে, কি বোঝে তা সে-ই জানে, হাত মুখ ধুয়ে আবার রওনা ছায়।

কয়েকদিন পরে বিকেলের দিকে বিমলা তখন বস্তা মাথায় ক'রে রেললাইন ধরে বাজারের দিকে চলেছে—একটু আনমনা হ'য়ে চলেছিলো ও। লক্ষ্য করে নি, কয়েক হাত পিছনে চ'লেছে রঘুর বাপ আর পিছে পিছে প্রায় নিঃশব্দে এসে প'ড়েছে এ্যাক মৃত্যুদূত—ইলেকট্রিক ট্রেন। রঘুর বাপ—'বিমলি ব'লে ছুটে গিয়ে অ্যাক ধাক্কায় সরিয়ে ছায় তাকে, কিন্তু ট্রেন চ'লে গ্যালো ভর্তি চালের বস্তা আর রঘুর বাপের উপর দিয়ে। 'আ...বি-ম-লি...জল'—জ্ঞান হারায় রঘুর বাপ।

লোক জড়ো হয়। লাইনের ওপর থেকে এগোয় মঙ্গল আর তার দলবল—'হুই ছ্যা, চ, কি হ'লো দেখি।' কিন্তু তার মা ওভাবে দাঁড়িয়ে ক্যানো? বাকরুদ্ধ হয়ে যায় মঙ্গলের,—'মা...এ...বাবা...। বিমলা অ্যাতোক্ষণে স্বাভাবিক হয়, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে,—মঙ্গল রে, এ আমার কি হলো রে'...কাঁদতে শুরু করে মঙ্গলও। ব্যস্ত কোলকাতার রেল লাইন আর পাথর চোখের জলটুকু নিংড়ে নেয় তাদের ভিতর থেকে।

হাসপাতাল। মঙ্গল আর রঘুকে নিয়ে ওদের বাপকে বিমলা দেখতে এসেছে। ডাক্তার কি বলবে, ও তো বুঝতেই পারছে—এই শেষ। যমদূত অ্যাকবার যাকে ছুঁয়েছে সে বাঁচে না। এলোমেলো ভাবে

বিমলার মনে আসে নানা কথা। নিজেকে অপরাধী ব'লে মনে হয়। তার কোলে রঘু অস্ফুট স্বরে 'মা, বাবা ঘুমিয়ে ক্যানো?' বলেই চুপ করে শিশু প্রবৃত্তি দিয়ে সে বুঝেছে কোথায় যেনো কি অঘটন ঘটে গিয়েছে। সহসা বিমলার মনে আসে শুভদৃষ্টির সময় রঘুর বাপের সেই চাউনি।

জ্ঞান ফেরে রঘুর বাপের। 'বিমলি রে, আমায় ক্ষ্যামা দিস, ব'লে সে মরণ ক্লান্ত চোখ দুটো বোজে। সাদা চাদরে শরীর ঢাকা। প্রথম শুভদৃষ্টির আলো শেষবারের মতো নেমে এসেছে তার উপর।

মঙ্গল চারিদিকে তাকায়। হাসপাতালের সাজানো-গোছানো, অজানা-অচেনা গন্ধ যেনো নীরব তর্জনী তুলে তাকে উচ্চ স্বরে কাঁদতে নিষেধ করছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে বলে,—'মা'। বিমলা তাকায়, সমস্ত দৃষ্টি দিয়ে আকুল ভাবে তাকে বলতে চেষ্টা করে,—'ভয় কি আমি তো আছি।' এ বুঝি রঘুর বাপের উপর তার অতৃপ্ত ভালো-বাসাটাকে তৃপ্ত করার চেষ্টা! দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে তার চোখ থেকে।

# আপনি, তুমি, তুই

সুবোধবাবু—সুবোধকুমার সরকার গত মাসে হরিহরপুর প্রাইমারি ইস্কুলের সাধারণ শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক হ'য়েছেন। সিরাজ সাহেব অবসর নেবার পর তাঁকে অ্যাক বছর ধরে ইস্কুল চালাতে হয়েছে। অ্যাখন তাঁকে আরো বেশি দায়িত্ব বহন ক'রতে হয়, হেডমাষ্টার পদের জন্য নির্দিষ্ট বেশি বেতন তিনি পান। আজ তাঁর একটু বিলাসিতা করার ইচ্ছা হলো। এস. আই. অফিসে তিনি রিকসায় যাবেন। পাশের গ্রামের রিকসাওয়ালা রামুকে খবর দিলেন সে যেনো সকাল ৯টায় তাঁকে নিতে আসে। বোলপুরের এস. আই. অফিস হরিহরপুর থেকে আট কিলো মিটার দূর, রিকসা ভাড়া দশ টাকা। তিনি সাধারণত সাইকেলেই এস. আই. অফিস যান। রিকসার জন্য কুড়ি টাকা ব্যয় করাটা তাঁর পক্ষে বিলাসিতা। বর্তমানে বেশি মাইনে পেলেও সংসারে বারো জন লোক।

কাঁচা রাস্তা ধ'রে রিকসা এগোচ্ছে। সুবোধবাবুর সমস্যা রামুকে তিনি আপনি অথবা তুমি কোনটা বলবেন। তাকে তুই বলে অসম্মান করা কখনোই উচিত নয়। অ্যাক সপ্তাহও হয় নি তিনি ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অ্যাক বক্তৃতা দিয়েছেন। সভার বেশ কয়েকজন বেকার আর মজুর উপস্থিত ছিলো। তাদের অনেকের ছেলেমেয়ে ওই ইস্কুলের ছাত্র। তিনি তাই বেকার সমস্যা সমাধানের উপর জোর দিয়ে ছিলেন ও বিশেষভাবে বলেছিলেন যে কোনো কাজই ছোটো নয়। অবশ্য কয়েকজনের মতে প্রাইমারি ইস্কুলের অনুষ্ঠানে ওই সব কথার কি দরকার। পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি। তিনি রামুদের গ্রামে থাকেন। তাঁর শরীর বিশেষ ভালো ছিলো না, তিনি রামুদের রিকসায় এসেছিলেন। রামু তাই ওখানে উপস্থিত ছিলো।

কিছুক্ষণ পর রিকসা পাকা রাস্তায় পৌঁছল। ঢালু রাস্তা দিয়ে রিকসা দ্রুত চলেছে। খোলা মাঠ ও রাস্তার দু'পাশের ঝোপঝাপের মধ্য দিয়ে

যেতে যেতে সুবোধবাবু চমৎকার হাওয়া উপভোগ ক'রছিলেন। বেশ মেজাজ এসে গিয়েছিলে। আপনি তুমির দ্বন্দ্ব তাঁকে বিরক্ত করার মতো অতো প্রবল রইলো না। রিকসা এস. আই. অফিসে পৌছতেই দ্বন্দ্বটা সুবোধবাবুর মধ্যে আবার ফিরে আসে। রামু ভাড়ার জন্য হাত বাড়ায়, 'বাবু। সে-ই যেনো সমস্যাটার সমাধান করলো। সুবোধবাবু পুরোনো অভ্যাস বলে তুই শুরু করেন—'তুই অ্যাকটার সময়ে আয়। আমাকে ঘরে নিয়ে যাবি। অ্যাখন পাঁচটা টাকা রাখ। কিছু খেয়ে নিবি।'

# স্বপনের ডাইরির সঙ্গে নির্মলার ভাবনার কোনো মিল নেই

…'আজ শিবানীপুর লাইব্রেরীর সদস্য হলাম। গ্রামে ঘুরে সময় কাটছে না। লাইব্রেরীটা ছোটোখাটো হ'লে কি হবে, কিছু ভালো বই আছে।

দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে গেলো। প্রথম দিন প্রায় কান্না পেয়ে গিয়েছিলো। তিন মাইল কাঁচা রাস্তা, এক হাঁটু কাদা। এই কয়েক মাসে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। শীতকালে খুব ধুলো ওঠে।

এই মুহূর্তে এখানে জয়েন করার দিনটার কথা মনে আসছে। বাড়ির গালাগাল, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা করবে,—'এখন কি করছিস?' আর পারছিলাম না।

গ্রামের নামটা বেশ শান্তশিষ্ট ধরণের। প্রথম দিন রাস্তা খুঁজে বার ক'রতে অবস্থা টাইট। কি চকচকে আকাশ! সৃষ্টিধরদা বলছিলো,—'আপনি রামপুরহাটের লোক, টাউনের লোক। এখানে আপনার খাবাপ লাগবে না।' সব লোকই গাঁয়ের নাম করে গেইছে।' পতিতপাবনদার সঙ্গে কথা কইয়ে দিয়েছিলো। দু'শ দশ টাকা মাসে দিতে হবে। ভাত, চা, জলখাবার সব ওখানে।'…

## নির্মলা বনাম ঝর্ণা

নির্মলা—এই ঝরি, শুন ক্যানে। ব্যাঙ্ক-কাকুটো খুব ভালো বটে। অনেক অঙ্ক ক'রে দিলে। রবীন মাস্টারের মারা বার করে দুবো। অ্যাকটো অঙ্ক না হোক, যা ক'রবে।

ঝর্ণা—হুঁ, ভালো বটে। আমাদের ঘরে সাঁঝে গে ব'সবে গা। কতো কথা গাইবে। উ তুদের বাড়িতে থাকবে, লয়? তুর বাবার

সাথে খুব বন্ধু হ'য়ে গেইছে।'

নির্মলা—তা বটে। কাল আকাশে চকচকে পারা কি উড়ছিলো বল?

ঝর্ণা— বে-লুন।

নির্মলা—অ্যাঃ! খুব জানো। প্যারা—কি যেনো। কাকু বলছিলো, বেজ্ঞানীরা ছেড়েছে। আকাড়া লাগছে, বান লাগছে—ই সব দেখার লেগে।

…'নিশাকর কাকা লোনের দরখাস্ত নিয়ে এসেছিলো। লোকটা ভেঙে প'ড়েছে। গতবারে প্রচণ্ড খরা হ'লো। এবার ক্যানেলের জল নিয়ে মারদাঙ্গা হ'চ্ছে। পাঁচ বিঘে জমি, সাত-আটটা মুখ। লোন শোধ দেবে কোথা থেকে? বড়োবাবু বলছিলেন, তোদের সময়ে কতো উন্নতি হয়েছে। সরকার ভালো মাইনে দিচ্ছে। আমরা আগে গ্রাম-সেবকের কাজ করেছি, হেল্‌থ্‌ সোসাইটি তৈরি করেছি। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে এতো সুবিধা ছিলো না। জ্যাঠামশাই-এর সময় এতো ঝামেলা ছিলো না। কারো জন্য লোনের কথা ব'ললেই আরেকজন ব'লে ব'সবে,—'আপনি সরকারী লোক। নিরপেক্ষ থাকুন।' আমি যেনো কাজ করছি না। রাজনীতি ক'রতে এসেছি।'…

ভিন্ন পরিচয়ে স্বপন মিত্র

শীলা—দিদি, তুকে কে পয়সা দ্যায়, আমি জানি। ব্যাঙ্ক-কাকু, লয়কো?

নির্মলা—তু জানলি কি করে?

শীলা—আমাকে কাল দিলে।

নির্মলা—কতো?

শীলা—না ভাই, বলবো না কো। কাকু মানা ক'রেছে।

নির্মলা—বেশিই হচ্ছে, লয়?

শীলা—আচ্ছা বাবা, বলছি। আট আনা।

( চলে যেতে যেতে ) দিদি, তু ব-লনি না, আমি ব-ললাম।

…'আজ সকালে দরজা খুলতে না খুলতেই কমলাকান্ত ব্যানার্জী হাজির। এমন করে এলো যেনো হঠাৎ দেখা হ'লো। 'বাড়ির খবর ভালো?' বলে তিনি শুরু করলেন। লাইব্রেরীতে 'মেয়েছেলে' ঢোকালে 'কেচ্ছা' হবে। গ্রামের জন্য ওঁর চিন্তার শেষ নেই। উনি ব'ললেন,—'দায়িকটো কে হবে?' ঘণ্টা খানেক পরে আনসার আলি এসে শাসিয়ে গেলো,—লাইব্রেরীর সদস্য হয়েছেন ভালো। কে সদস্য হবে না হবে, আপনার না ভাবলেও চলবে। তার জন্য কমিটি আছে। এখানকার ইয়ং ছেলেমেয়েদের লাইব্রেরী সম্পর্কে উৎসাহিত করায় এঁর রাগ। যুব সমাজ সচেতন হ'লে এঁদের অসুবিধা। দু'জন পরামর্শ বোধহয় ক'রে এসেছে। পয়লা নম্বরের রাজনীতিবাজ লোক আনসার আলি। পয়সাকড়ি করেছে। বাইরে যাতায়াত আছে। কথাবার্তা ধারালো। তবু গোড়ায় গলদ যাবে কোথায়? দ্বিতীয়জন 'মুরুব্বিলোক।' প্রচুর বই পড়ে। 'এতো বই গাঁয়ের কারো বাড়িতে যায় না কো।' কথায় কথায় উনি জানাতে ভোলেন না। অথচ বিষয়বস্তু শস্তা উপন্যাস। ইনি 'মেয়েছেলের' লেখা বই প'ড়তে পারেন না। তাজ্জব ব্যাপার।'

'চমকি উঠিনু লাজে'

—এই—এই মারবো। ব্যাঙ্ক-কাকুটো যা—বলে উ আমাকে বিয়ে করবে—আমিও কি বলে ফ্যাললাম ই-মা—কাকুটোর লেগে হলো। যদি ঝরিরা জানতে পারে? বাবা জানতে পারবে—ই-মা—কি হবে—

…'আজ নির্মলাকে লাইব্রেরীর সদস্য হবার জন্য বললাম। চাঁদা

আমি দেবো, ওকে বলেছি। 'শুধু চানাচুর খেয়ে কি হবে'—বলা উচিত হলো না। কথাটা একটু কড়া হয়ে গেলো। উঃ! মেয়েগুলো এতো পিছিয়ে আছে। পরনিন্দা, পরচর্চা আর ঝগড়া ছাড়া কিছু জানে না। গ্রামের শিক্ষিত লোকেরা মুখে যা বলুন, কাজে অন্যরকম। মেয়েদের দাবিয়ে রাখার অভ্যাস বহুকালের। এতো সহজে কি তা যায়?

আনসার আলি ম্যানেজারকে নিশ্চয় কিছু বলেছে। এছাড়া ওনার ব্যবহারের পরিবর্তনের কোনো কারণ নেই। খামোখা বদনাম কিনে, উপরওয়ালার সঙ্গে গণ্ডগোল ডেকে এনে কি লাভ?

'বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি'

—এ মা, পয়সা দে। চপ লিয়ে আসি। ব্যাঙ্ক—কাকু মুড়ি খাবার লেগ্যে আইছে। উ কি জেতের বটে গো? কায়েত—লয়?' নির্মলা পয়সা নিয়ে দ্রুত দোতলা থেকে নামে। ওর চলার মধ্যে আনন্দের ভাবপ্রকাশ পায়। ও মায়ের কাছ থেকে পঞ্চাশ পয়সা আদায় করতে পেরেছে।

...'সন্দীপ বলছিল,—'ওঃ শালা, ওই জায়গায় কারেন্ট আছে কি নেই, না আছে সিনেমা—সময় কাটাস কি করে? আমার মাইরি শুনে কান্না পাচ্ছে। কি ব্যাপার? ও ব্যাটা কোনোদিন এর নাগাল পাবে না। নির্মলার মা কিছু বুঝতে পেরেছে? সকালে হাতের ইশারায় ওকে ডাকলে ওর বোন শীলা মায়ের কানে কানে কি বললো। মা মুচকি হেসে শীলার কান মলে দিলো। নির্মলার মা ব্যাপারটাকে সমর্থন করছে? শীলার বয়স সাত আট বছর হবে। ওকি কিছু বুঝতে পেরেছে? কি জানি, আজকাল সকলেই চালাক হয়ে যাচ্ছে। শীলা ওর বাবাকে বলে দেবে না তো? পতিতপাবনদা আমুদে লোক। এদিকে নির্মলা ওর বাবাকে বেশ ভয় করে।...

'একটুকু ছোঁয়া লাগে'...

নির্মলা—এ ঝরি, তু 'লাইব্রেরী' যাবি ?

ঝর্ণা—তুকে বলেছে ?

নির্মলা—আমি যাবো নাকো। বেটা ছেলেরা যায়, মাস্টাররা থাকে। লাইব্রেরীর লোকটো কেমন পারা বটে। না ভাই, আমি যাবো নাকো। ধ্যুৎ কাকুটো না—

ঝর্ণা—কি মজা! তু কাকুর মতো ধ্যুৎ বলতে শিখে গেইছিস।

…'ওখানকার কয়েকজন ছেলেমেয়েকে রামপুরহাট আসার কথা বললাম। গ্রামের ব্যাপার শুধু ওকে বললে কোথা থেকে কি হবে। চিন্তার আরো কারণ আছে। ওর বাবা পতিতপাবনদা রাজনীতি করে! আনসার আলি ওর বিরোধী লোক। আনসার আলি যা খুশি তা রটাতে পারে। ওরা দু'পক্ষ লাগবে, ভুগতে হবে আমাকে।

কাল যেতে হবে। কাজের লোক দু'দিন আসছে না। আগামী কালও হয়তো আসবে না। ভোর চারটেয় উঠে বেরোবো। একটু বেলা হলে মা রান্না করতে শুরু করবে। অতো সকালে ওঠা কঠিন। হোক শিবানীপুর পৌঁছিলেই নির্মলার সঙ্গে দেখা হবে।

মাসখানেক আগে ও বলেছিলো,—বেটাছেলেদের হাতে সব পয়সা, মেয়েদের হাতে পয়সা থাকে না। কার কাছে চাইবো, তো পাবো, না গো? যদি তুমি আমার ঘরে আসো চিরদিনের মতো, তোমার কষ্ট হবে না।

এসব কি লিখছি? নির্মলা শুনলে বড়ো জোর ঠোঁট ওল্টাবে। দোষ ওর নয়। এ জায়গার যা পরিবেশ! কিছুদিন আগে একটি পত্রিকায় 'পুরুষ শাষিত সমাজে মহিলা অঞ্চল প্রধান' নামে একটি রচনা ওকে দেখিয়ে ছিলাম। একটি গরীব মেয়ে কি করে তার স্বামীর সাহায্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। ও মন দিয়ে পড়লো। বললাম, লাইব্রেরীতে পেলে আরো কাগজপত্র পড়তে পারবে। কেনো যে ও কিছুতেই আসতে চায় না।

ওকে ৭।৮।৮৬ 'যুগান্তর' পত্রিকায় ফুলরেণু গুহের সাক্ষাৎকার পড়তে হবে। হাতের কাজ শিখে গরীব মেয়েরা কি করে স্বাবলম্বী হয়েছে জানলে ও নিশ্চয়ই উৎসাহিত হবে।'...

'আরো কি বাণ তোমার তূণে আছে'

নির্মলা—ব্যাঙ্ক-কাকুটো কি রকম বটে। তুকে কি বলেছে?

ঝর্ণা—হুঁ। উদের বাড়ি নিয়ে যাবে বললে। দাদাকে খুব করে বললে।

নির্মলা—আমাকেও বললে। আমি থাকতে পারবো না কো। মামাবাড়িতে তাই থাকি না কো।

ঝর্ণা—আমরা যাবো না কো। দাদা যাবে না। ব্যাঙ্ক-কাকু মাকে বলে দিলে। মা গাল দিলে গ্যালাম না সেই তার লেগ্যে।

নির্মলা—কমল বটে লোকটো। তুর মাকে লাগাইছে?

...'সকালে নির্মলা ওর মাকে জিজ্ঞাসা করছিলো, কায়স্থ কি জাত এবং তারা রাগী হয় কি না। ও হলো ময়রা। ধ্যুৎ! ওকে ভালোবাসি এই হলো সব চেয়ে বড়ো কথা।

ও আমার জীবনে কি স্থায়ী ভাবে আসার কথা ভাবছে? কয়েকদিন আগে অঙ্কের বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো। মেয়েটা কথা বলার কায়দায় চমকে দেয়। বুদ্ধি আছে, চেষ্টা নেই। যতোই নিষেধ করো, ও বাগড়া দেখতে ছুটবে। একটা বাজে ব্যাপার, অনেকবার ডাকলেও সাড়া দেবো না। ওর মায়ের সামনেই বললাম, আমার সঙ্গে এমনি করছো, আমি মনে করবো না। বাইরের লোকের সঙ্গে এরকম করলে সবাই বলবে মেয়েটা কি রকম। মা বললো,—'শুনতে পায় নাই কো, তাই বা কাড়ে নাই।' ওর মা মুখটা এমন করলো। অথচ বৌদি সম্পর্ক বলে কতো ঠাট্টা-তামাসা করে। এই তো সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাতে খাবার জন্য দু'তিন বার ওকে ডাকতে পাঠিয়েছিলো।

শুনতে পাইনি। ওর মা ভাত দেবার জন্য অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলো। এরা এই রকম ধরণের! কিসে কি বোঝে!...

'অগ্নিবাণে তূণ যে ভরা'

ঝর্ণা—চ, ব্যাঙ্ক-কাকুর কাছকে। বাংলার মানে বুঝে লেবো।

নির্মলা—তু যা গা।

ঝর্ণা—আমি কাল অঙ্ক করতে যাবো। কাকু বলছিলো কি অঙ্ক করলে বুদ্ধি বাড়ে।

নির্মলা—উ সব জানে। এবার তু বল ক্যানে, ইংরাজি পড়লে বিদ্যে বাড়ে। তু শুনিস নাই, উ কি বলেছে?

ঝর্ণা—কি?

নির্মলা—রীতাদের ঘরে উ বলেছে, ই গাঁয়ের মেয়েগুলা খুব শয়তান।

ঝর্ণা—এই তো খানিক আগে আমাকে চপ খাওয়ালে। তু ভালো করে শুন গা। তুকে কে বললে, তু শুনে নিলি।

নির্মলা—তুকে চপ খাওয়াইলে, তু ইবার উর পক্ষে গাইবি।

...'সেদিন সকালে নির্মলা মুখ ধুতে যাচ্ছিলো। হাতের ইশারায় ডাকলাম। বাবাকে দেখতে পেয়ে আসলো না। তারপর ৫।৭ দিন কেটে গেলো, ওর দেখা নেই। হ্যাঁ গো, আমার মনের অবস্থা কি বোঝো না? ওকে বলার সুযোগ পাচ্ছি না। একটা চিঠি লেখা ভালো। সকালে ও পড়তে বসবে, তখন দেখালে হবে। কেউ কিছু ভাবার সুযোগ পাবে না। ডায়েরিটাই ওকে পড়িয়ে নেবো।

সুপ্রিয় নির্মলা,

জানি না, সেদিনের কথা তোমার মনে আছে কিনা। তিন বছরের বেশী হলো। তখন তোমার বয়স বারো বছর হবে। তোমাদের দু' বোনকে কাকু সম্পর্ক ভেবে আদর করতাম। গত বছর একদিন তুমি জিজ্ঞাসা করলে, অনেক দিন আগে শীলাকে কি দিতে? আমি বললাম —পয়সা? তুমি বললে—পয়সা, চানাচুর, জিলিপি, মাথার ক্লিপ

কিছুই নয়। সেদিন দু'তিন ঘণ্টা ভেবেও বুঝতে পারি নি। অভিমান করে তুমি বলেছিলে, বলতে পারবে না। আমাকে বুঝে নিতে হবে। অনেক পরে হঠাৎ বুঝতে পেরে অবাক হয়েছিলাম। ভাবিনি ওই চুমু তুমি অন্যভাবে নেবে।

এর কয়েকদিন পরে পাশের বাড়ির ছেলেমেয়ে দুটো ঝগড়া করলো। ছেলেমেয়েকে সামলাতে পারে নি, তাই তাদের বাবা তাদের মাকে মারলো। তোমার উপর সেদিন আমার মায়া হয়েছিলো। কার ঘরে যাবে, সে তোমাকে মারবে। বলেছিলাম, আমাকে বিয়ে করবে? তুমি শুনে পালিয়ে গিয়েছিলে। ভেবেছিলাম, তুমি রাজি আছো। তারপর মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে রাগিয়ে দিয়েছি, কথা বন্ধ করেছো। আবার আপনি কথা শুরু হয়েছে। মনে পড়ছে? একদিন বলেছিলাম, তোমাকে কোলকাতায় নিয়ে যাবো। তুমি বলেছিলে, আরো বড়ো হলে যাবে।

এখন তুমি বড়ো হয়েছো। হয়তো ভাবছো কাকু সম্পর্ক, বিয়ে হতে পারে না। ওগুলো ভুল ধারণা। অনেক আগে চলতো। তুমি এই যুগের মেয়ে, লেখাপড়া শিখছো। তুমি অন্যরকম করে চলবে। তোমার বাবার সঙ্গে স্বপ্নধরদা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। ও তোমার বাবাকে দাদা বলে, তাই আমিও বলি। আসল হলো ভালোবাসা। ভালোবাসা অন্যায় নয়। যখন আসবার—ঘরে সোজা আসবে। এদিক ওদিক বারবার তাকিয়ে, লুকিয়ে এলে অন্যের সন্দেহ হবে। বুঝতে পারছি, আমাকে বিয়ে করতে তুমি রাজি কিনা, বলা তোমার পক্ষে কঠিন। তোমার মতটাই প্রধান হওয়া উচিত। ঘর-সংসার তুমিই করবে। তোমার কথাই সব কিছু। পতিতদা-বৌদিকে আমি রাজি করাবো। কয়েকদিন পরে চিন্তা করে সব জানিও। মনে রেখে, তুমি মেয়ে। তোমাকে জোর করে হলেও বাড়ি থেকে বিয়ে দেবে যেখানেই হোক। ইতি—

তোমার···

## 'ভাঙল মিলন মেলা ভাঙল'

কাল সরলা দিকে নব জামাইবাবু খুব বকলে। সবাই শুনলে। অঙ্কের মাস্টার। হবে না? খানিক মাস্টার পাড়া বটে। লোকটো খুব চুয়াড়। উ সব লিখতে আছে? আমি উ চিঠি পড়ি নাই কো। কুনোদ্দিন পড়বো না।

—মেলে না।—মেলে না।

## নিজের জগতে সুখলাল

সুখলাল। সঙ্গে ওর দলবল। হই হই করে ওরা বাঁদর তাড়াবার জন্য ছুটলো। 'আঃ আঃ—ভুলো ছুঃ' বলতেই ভুলোরা ভৌ ভৌ ক'রতে ক'রতে ছোটে। ওদের কালো কালো চেহারা, পাঁচ থেকে আট-নয় বছরের ওরা। সুখলাল দশ-অ্যাগারো। মাথার চুল তেলের অভাবে কটা। কারো পরনে পুরোনো ছেঁড়া ইজের, কেউ কেউ উদোম। কেউ একটু পরিষ্কার, কারো গায়ে কাদা। ঠ্যাং খোঁড়া দলছুট অ্যাক হনুমান টিনের চালে হুড়ুম করে লাফালো, পরে তেঁতুল গাছের মগডালে লুকোলো।

সুন্দর ট্রাউজার আর ব্যাগি জামা গায়ে মোতাহার আসছিলো। ও সাধারণত লুঙি-গেঞ্জি পরে। ওই পোষাক ওকে দেখে সুখলাল চ্যাঁচালো,—'ইঃ! মস্তান হইছে।' মোতাহার ফিরে দাঁড়াতে দলটা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোটে।

বাউরি পাড়ার বাঁশঝাড়—ডোবার পাশ কাটিয়ে, পায়ে হাঁটা সরু পথ ধ'রে সুখলাল ওদের বাড়ির উঠোনে আসে। আশেপাশে কয়েকটা চালাঘর। সব গুলোরই হতদরিদ্র চেহারা। তিন-চার বছর ছাওয়ানো হয়নি। উঠোনের উত্তর-পূর্ব দিকে দুটো তালগাছ, একটি ডুমুর গাছ। পঁচিশ-ত্রিশ মিটার দূরে অ্যাকটা বড়ো পুকুরের পাড়ে তেঁতুল গাছের ভিড়। তারপর আশ্বিনের বিস্তৃত ধানখেত। দূর দিগন্তে আবছা পাহাড়।

ওর মার সঙ্গে বাবার কাক-চিল তাড়ানো ঝগড়া লেগেছে। বাপ রাত-ভোরে উঠে আড়কাঠি ঝাড়তে বেরিয়েছিলো, সবে ফিরলো। লুঙি ভেজা, গেঞ্জিতে কাদার ছিটে। চোখ লাল, ঠাণ্ডা লেগেছে। সুখলালের বাপ উঠোনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওর মা বলে,—'ঘরে চাল নাইকো, ইদিকে সকাল বেলা চোখ নীল। গতর খেকো, মাছ ধরার নাম করে

মদ খেয়ে'্য আইছে।'

সুখলালের ভয় হয়। অনেকক্ষণ হ'লো ও ঘর থেকে বেরিয়েছে। ওর মা গাল দেবে, বাপ তেড়ে আসবে। উঠোনে পা দিয়ে ও পেটে জ্বালা বোধ করে। মনে প'ড়ে যায়, ও আগের রাতে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। মা-বাপ ঝগড়ায় মেতেছে, ওর দিকে কেউ অ্যাখন তাকাবে না। ও স্বস্তি অনুভব করে।

আড়চোখে চারিদিক দেখে নিয়ে ও ঘরে ঢোকে। ছোটো দরজা। ঘরের মধ্যে দিনের ব্যালায়ও আবছা অন্ধকার। অ্যাক কোণায় তিন-চারটে পুরোনো টিনের কৌটো। নেড়ে চেড়ে সুখলাল ছাখে সবগুলোই খালি। মা চালভাজা কোথায় সরিয়ে রেখেছে। একটু খুঁজতেই ও পেয়ে যায়। পুরোনো কাগজ কুড়োয়। চালভাজা কটা চেলে নিয়ে ও সব কিছু ঠিক আগের মতো রেখে বেরিয়ে পড়ে। চালভাজা চিবোতে চিবোতে ও চলেছে, ভুলো দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে। সুখলাল অ্যাকটা তেঁতুল গাছের তলায় বসে। 'লেখা'—বলে ভুলোর সামনে অ্যাকমুঠো চালভাজা ছড়িয়ে ছায়। ওর গলা জড়িয়ে ধরে অ্যাক সঙ্গে খায়।

বিশাল পুরোনো বটগাছ। আশেপাশে নানা ফুলগাছের ঝোপ। গাছের ঠিক নিচে পরিষ্কার ফাঁকা জায়গায় কালীরথান। রাত ৮টা। যাত্রার মহড়া চ'লছে। কালীপুজোর পরে দল আসরে নামবে। লণ্ঠনের আলোয় দক্ষিণ পূর্বে একটু দূরে পাঁঠাবলি দেবার খুঁটো, আরও দূরে ভাঙা মাটির দেওয়াল ছাখা যাচ্ছে। এই থান কতোকালের জানে না। অনেক দূর থেকে লোকে এখানে অসুখ সারাবার জন্য আসে।

উত্তরাংশে লোকের ভিড় একটু কম। ওর ফাঁক দিয়ে সেবাইত হরি বাগদিদের মাটির বারান্দায় আলো এসে প'ড়েছে। বাইরে হঠাৎ জিপের আওয়াজ। অনিল পোষ্টমাষ্টার গানের মহড়া দিচ্ছিলো, থেমে চারিদিকে তাকায়। আসরের আলো। ভিড়ের ফাঁক দিয়ে বাইরে দাঁড়ানো জিপেরও নেমে আসা পুলিশের দলের উপর পড়ে। কেউ চাপা গলায়

বলে,—'পুলিশ এয়েছে রে। ঠিক শুকনো গড়ের লাশটার খোঁজে। অনেকে ব্যাপার বোঝার জন্য এগিয়ে যায়। জটলা ও আলোচনা। আলোতে সুখলালকে অ্যাক ঝলক দ্যাখা যায়। পর মুহূর্তে ও আর পুলিশের দল নড়েচড়ে ব্যাড়ানো ছায়ার আড়ালে চলে যায়। অনিল দে-কে পুলিশ জিগ্‌গ্যেস করে,—'আপনি লাশটার ব্যাপারে কিছু জানেন? 'উত্তর পায়,—'না'। ভারি জুতোর আওয়াজ। গাড়ি ছেড়ে যাবার শব্দ।

সকাল। সুখলাল ঘুম ভেঙ্গে দ্যাখে ও কালীর থানে শুয়ে আছে। গত রাতে কালীপুজো হ'য়ে গিয়েছে। ঢাকের আওয়াজ। ওর গায়ে বাবার অ্যাকটা পুরোনো গেঞ্জি। মোতাহারকে ব্যাগি পরতে দেখে ও ওটা পরেছে। সুখলাল উঠে সামনের পুকুর থেকে মুখে-চোখে জল দ্যায়। কে ক্যাসেট প্লেয়ার এনেছে। ফিল্মি গান বাজছে—'মেরে অঙ্গনে মে তুমহারা ক্যা কাম হ্যায়।' সুখলাল দুলতে শুরু করে। বাজনা শুনলে নিছিলের স্লোগান শুনলে সুখলালের গা দুলতে শুরু করে। মহরমে, ভাদুমায়ের ভাসানেও তাই নাচে—মিঠুনের নাচ।

২

রোদ ঝলমল দিন। ব্যালা অ্যাগারোটা হবে। সুখলাল আর তার সঙ্গিরা মার্বেল খেলছে। মাটিতে অ্যাকটা ছেটো গর্ত। ওর সঙ্গি গুবলা ব'ললো—'তুই তুই।' চারিটি মার্বেল হাতে নিয়ে গুবলা দু' তিন মিটার দূরে দাঁড়ালো ও গড়িয়ে দিলো। সুখলাল অ্যাকটা গুলি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দ্যায়। গুবলা ওটা বাদে অন্যগুলোকে আটা অর্থাৎ অ্যাকটা বড় মার্বেল দিয়ে মারার চেষ্টা করে। সুখলাল চ্যাঁচায়,—'ক্যান্সেল।' কাড়াকাড়ি, মারামারি লেগে যায়। আক্রোশে সুখলাল চিৎকার করে,—'তু মিছে বলবি ক্যানে?' লিজ-জে দেখেছি।' ওর দাবি ও যেটাকে দেখিয়ে ছিলো আটা সেইটায় লেগেছে। অতএব, চারটে মার্বেল ও পাবে। যে মার্বেল দেখিয়ে দেবে, তার প্রতিপক্ষের

মার্বেল যদি মেটাতে লাগে তাহলে সবগুলি প্রথম পক্ষ পাবে। এই খ্যালার এই নিয়ম।

অন্য ছেলেরা রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে মারামারি দেখছে। কে হারবে কে জিতবে বোঝা যাচ্ছে না। যে জিতবে সে হবে ওদের লিডার। এ রকম অলিখিত নিয়ম ওদের মধ্যে আছে। দু'তিন মিনিট গ্যাখার পর বুধন বলে,—'উরা আগে থিক্যে গরম হয়ে রইছে। সুখলাল ঘালু ফুড়োলের মোষ চরাইছিলো। উ পিঠে উঠতে যে ছিলো নিয়ে গুবলা উঠে পড়লে। বাস, লেগ্যে গ্যালো।' একটু বাদে বাইশ-চব্বিশ বছরের ছোকরা দশরথ, মোতাহার দেখতে পেয়ে ওদের আলাদা ক'রে দিলো।

৩

রঙিন ফ্রক পরে মিলি ইস্কুলে যাচ্ছে। হাতে বই-খাতা। সুখলাল যেনো দূরে থেকেও ওর সুন্দর ক'রে আঁচড়ানো চুলের গন্ধ পায়। ওর মিলির চুল গুলো ছুঁয়ে গ্যাখার খুব ইচ্ছা হয়। ও যদি তার বন্ধু হতো! সে কি হয়? ও ঘোষদের বাড়ির মেয়ে, ওদের কতো টাকা!

মোতাহারের উহার রাগটা নোতুন ক'রে ফিরে আসে। ও গুবলার কাছে প্রায় হেরে যাচ্ছিলো। লড়তে লড়তে ও মিলিকে দেখতে পেয়েছিলো। কোথা থেকে শক্তি পেয়ে ও গুবলাকে 'আচ্ছা দিতো।' এই সময় মোতাহার এসে ছাড়িয়ে দিলো।

ঘোষদের বাড়িতে দু'তিন সপ্তাহ আগে টিভি এসেছে। গ্রামের নানা বয়সের ছেলেমেয়েদের ভিড়। সুখলাল। স্পাইডারম্যান সিরিয়াল।

পুলিশের জিপ ওর কল্পনায় ভেসে আসে এই মুহূর্তে সুখলাল ওদের পছন্দ ক'রতে পারছে না। অতো ক্ষমতা ওদের নেই। যদি স্পাইডার-হওয়া যেতো—ও দেখছে আর ভাবছে। তাহ'লে 'ফাস্টেই' ও

মোতাহারকে দেখিয়ে দিতো। তারপর গুবলাকে—তারপর ঘোষদের তিনতলা বিরাট বাড়ি দখল ক'রতো।

৪

ঘোষদের আখমাড়াই তিন-চারদিন আগে হ'য়ে গিয়েছে। বড়ো গর্ত। মধ্যে আখের ছিবড়ের ছাই। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে আখের ছিবড়ে ছড়ানো-ছেটানো। একটু দূরে সদ্য কাটা আখের খেত। পরপর মাঝারি সাইজের দুটো পুকুর। আশেপাশে বেশ কয়েকটা গরু চ'রছে। গ্রামের রাস্তা দিয়ে সাইকেল নিয়ে মোতাহার দুবরাজপুরের দিকে চলেছে। মিলি পুকুরের ওপার থেকে উপরে উঠে আসছে। ক্রমশ তার মাথা, শরীর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

সহসা সুখলাল উত্তেজনা অনুভব করে। এই মুহূর্তে ও নিজেই স্পাইডারম্যান। ভেতরের আলোড়ন থেকে কয়েকটা কথা ওর মুখে উঠে আসে। গর্তটাকে দেখিয়ে ও সঙ্গিদের বলে,—'ইখানে ঝাঁপ দিতে পারবি? আমি পারবো।' সঙ্গিরা কিছু বোঝার আগেই ও ঝাঁপিয়ে পড়ে। অমানুষিক চিৎকার। সঙ্গিরা ছুটে পালাচ্ছে—পালাচ্ছে গুবলাও। একটু পরে কয়েকজন আসে। দড়ি এগিয়ে দিয়ে বহু পরিশ্রমে সুখলালকে গর্ত থেকে উদ্ধার করে।

নিজের উঠোনেও ব'সে আছে। গা-পিঠ অনেকটা পুড়ে গিয়েছে। পুরুষ মেয়েতে মিলিয়ে নানা বয়সের পঁচিশ-ত্রিশ জন। ওরা সবাই দেখছে। কেউ আফশোষ করছে, কেউ বলছে,—'তু উখানে ঝাঁপাইলি ক্যানে?' ভুলো এসেছে। ও করুণ আর্তনাদ তোলে, সুখলালের পোড়া জায়গা চাটতে যায়। কেউ ওকে তাড়িয়ে ছায়।

উঠোনের অ্যাকদিকে খোলা অবস্থায় অ্যাকটা গোরুর গাড়ি। পাশেই দুটো গোরু কাটা খড় খাচ্ছে। খড় কাটা বঁটি মাটিতে শোয়ানো। অপরদিকে জটলা-গুঞ্জরণ। সুখলালের মার কান্নাকাটি। আশপাশের বাড়ির কয়েকজন বউ ওকে থামাবার চেষ্টা ক'রছে। ছোকরা

বয়সী অ্যাকজন বলে,—'তাড়াতাড়ি করো গো। হাসপাতাল দু' কোশ রাস্তা। সাঁঝ লেগ্যে গেইছে।'

অল্পক্ষণের মধ্যে গোরুর গাড়ি হাসপাতালের রাস্তা ধরে। গাড়ির পিছন পিছন বেশ কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ ও বাচ্চা ছেলের দল এগোয়। তাদের পিছনে ভুলো। অ্যাকে অ্যাকে মানুষের সংখ্যা কমে। ভুলো মুখ তুলে গন্ধ শোঁকে। মেঠো রাস্তায় আর কেউ নেই। গাড়ি গ্রাম ছাড়িয়ে এসেছে। গাড়ির মধ্য থেকে দু'তিন জনের গলার অস্পষ্ট আওয়াজ।

৫

দশ-বারো দিন হ'লো হাতপাতাল থেকে সুখলালকে ছুটি দিয়েছে। বাড়ির উঠোনে ও অ্যাকটা পুরোনো কাঁথায় বসে আছে। মতুবিবি ওকে দেখতে এলো। ওর মা বলে,—দেখছো গো, ডাক্তার হাঁটাচলা 'প্যাকটিস' করতে ব'লসে। উ করবে না কো।'

'এ মা, পায়ে খুব বাজছে'—সুখলাল বলে। আজ সকালে অনিল পোস্টমাস্টারের মা ওকে দেখে গিয়েছে। আর মিলি—মিলি এসেছিলো ওকে দেখতে! বিছানায় পড়ে থাকতেও সুখ যদি মিলি আসে। অনিচ্ছার সঙ্গে সুখলাল ওঠার চেষ্টা করে। কষ্ট হয়, ধপ করে বসে পড়ে। হঠাৎ ওর মনে আসে দিন পনর বাদে পটরস গানের আসর ব'সবে। ও আবার উঠলো। বেশ কয়েক পা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটলো।

৬

রাত দিয়ে ঘেরা গাছ আর গাছ দিয়ে ঘেরা ফাল্গুনের রাত। মা ওকে খাইয়ে দিয়েছে, আদর করে দিয়েছে। ও অনে-ক দিন ভালোবাসা পায় নি। কতোদিন, ও ব'লতে পারবে না। ও ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি। ঘরে টিমটিম ক'রে অ্যাকটা কুপি জ্বলছে। সুখলালের গায়ের ময়লা, ছেঁড়া কাঁথা আবছা ছ্যাখা যাচ্ছে।

ও কার ছোঁয়া পেয়ে সজাগ হয়। গভীর আদরের স্পর্শ। মিলি? না, ভুলো। কোন ফাঁকে কাঁথার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, ওর আধ শুকনো ঘা চেটে দিচ্ছে।

## ভাগ্যচক্র

—'অ্যাকটা টিকিট নিন না। হরিয়ানা-ভুটান পাচ্ছেন, মণিপুর পাচ্ছেন।' দুর্গা মেয়েটার দিকে তাকায়। বয়স ত্যারো কি চোদ্দ, মুখে-চোখে অযত্নের কয়েক স্তর। পোষাকে দারিদ্র্য ঢাকার চেষ্টা। সে নিম্ন-মধ্যবিত্তের পিছল শেষ ধাপ থেকে পড়ে গিয়ে ডুববার মুখে।

—'দাদা, নিন না। অ্যাকটা মণিপুর নিন। আগামীকাল খ্যালা, ১৬ তারিখে। এই দেখুন। অ্যাক টাকা।'

দুর্গাচরণ একটুক্ষণ ভাবে। পেটে কিছু দিতে হবে। গ্যাখন বড়ো জোর সকাল ৯টা। সিউড়ি থেকে গ্রামে ফিরবার বাস ১১টার আগে নেই। ভবানী ঘোষ ওষুধ কিনতে টাকা দিয়েছে। শেষে ম্যানেজ হ'য়ে যাবে মনে ক'রে দুর্গা বলে,—'দাও অ্যাকটা'। সে জিগ্‌গ্যেস করে,—'তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়?' সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হয় সে ভালো করে নি। অ্যাকটা অপরিচিতা মেয়ে। কথাটা কি ভাবে নেবে, ঠিক নেই। মেয়েটা উত্তর ছায় না, টাকাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি এগোয়।

দুর্গা বাড়ির বড়ো ছেলে। সব দায়িত্ব তার উপরে। গত দু'বছর ধ'রে সে একটি সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য খুব চেষ্টা ক'রছে।

পিছন ফিরে দুর্গা সুতনুকে দেখতে পায়। সে দুর্গার হাত চেপে জিগগ্যেস করে,—'কি রে, ক্যামন আছিস? কি করছিস?' ছ'মাস পর তোর সঙ্গে ছাখা হলো। কতো দিন! লটারির টিকিট কিনছিস?' সুতনু হাসে,—'অ্যাকদিন ব'লেছিলি বটে। এদেশে জন্মালে জোর ক'রে ভাগ্যবাদী তৈরি ক'রে দেওয়া হয়।'

দুর্গা,—'তুই কিন্তু বললি না, কোথায় আছিস, কি করছিস। আমি ঘর দোর, চাষবাস ছাখাশুনো ক'রছি। ধর ওটাই চাকরি।'

'হ্যাঁ, ধরলাম মেয়েটা তোকে ভাগ্যবাদী বানিয়েছে। জানিস না

তো, কি জিনিস।' সুতনু ভ্রূ নাচিয়ে হাসে।

দূর্গা হেসে জবাব ছ্যায়,—'তোর উত্তর পেয়ে গেলাম। ভালোই আছিস। তোকে ভালো রেখেছে কে? বর্ণা? তোর কথাগুলো বেশ রসালো।'

সুতনু লজ্জা পায়। একটু পরে লজ্জা কাটিয়ে বলে,—'বাবার ব্যবসা ছ্যাখাশুনো করছি। অ্যাকটা ভালো কোম্পানীর এজেন্সী নেবার চেষ্টা করছি। চল, চা খাবি।' দু'জনে পছন্দসই চায়ের দোকানের খোঁজে এগোয়।

দূর্গা,—'তোর মনে আছে? আমি বোলপুর গিয়েছিলাম। তোর সাথে বর্ণা ছিলো। একটু পরেই তোরা এ ওর সাথে তর্ক ক'রতে লেগে গেলি। তুই ব্যবসার পক্ষে আর বর্ণা চাকরির পক্ষে।

সুতনু—খানিকটা সময় পেলাম। চালিয়ে যাই। 'তুই আমাদের লেখাপড়ায় ভালো ছেলেদের অ্যাকজন ছিলি। ভাগ্য না থাকলে তোর মতো ছেলের এই অবস্থা হয়?' এই কথা বলার মতো অতো ভাগ্যে বিশ্বাসী সুতনু নয়। শেষের কথাটা সে তর্ক করার অভ্যাসে বলে। দূর্গার প্রতি সহানুভূতিও তার গলার স্বরে ফুটে ওঠে।

দূর্গা—হ্যাঃ। সব কিছুই ভাগ্য নয়। ব্যবসাদারের বজ্জাতি, স্বজন-পোষণ ভাগ্য নয়।

সুতনু চুপ ক'রে থাকে। দূর্গা আবার রসিকতা করে,—'যখন ইস্কুলে পড়তিস, তখন এমনি চুপ করে থাকতিস। বর্ণা তোকে আচ্ছা তক্ক করতে শিখিয়েছে।'

ওরা সিউড়ি বাস-স্ট্যাণ্ডে পৌঁছয় এবং পছন্দসই মিষ্টির দোকানে ঢোকে। ওরা দু'কাপ চায়ের অর্ডার ছ্যায়।

সুতনু,—তুই আমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছিস।

দূর্গা—ও কথা ব'লতে ভালো লাগে না। আমি অতি সাধারণ ইস্কুলে দশজনের মধ্যে অ্যাকজন ছিলাম। তুই সারা জেলা বা পশ্চিম-বাংলার কথা মনে কর। দেখবি, আমাকে ভালো ছেলে মনে হচ্ছে না।

সুতনু ব'লতে যায় যে, বাত্তিস্কারের অভেদানন্দ বিদ্যাপীঠ অতি সাধারণ স্কুল নয়। বীরভূম জেলার বাইরে থেকে সেখানে ছাত্র আসে। তাকেও ইস্কুলের হোস্টেলে থাকতে হ'তো। তাদের বাড়ি তখনও সিউড়িতে ছিলো। কিন্তু সে বোঝে—এতে দুর্গার কাটা ঘায়ে খোঁচা দেওয়া হবে। সে মাথা নিচু ক'রে বলে,—'তুই ভাগ্য না মানতে পারিস, আমাকে মানতে হয়। আমি যে ব্যবসায়ী।'

২

দুর্গা এবং সুতনু দোকান থেকে বেরিয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডে আসে। বাস ছাড়তে দেরি আছে। দুর্গা বলে,—'সুতনু, আমাদের বাড়িতে চল। ক' বছর আগে সেই আমার বোনের বিয়েতে গিয়েছিলি।' দুর্গা জানে সুতনু ব্যস্ত থাকে। সে তাই বলে,—'তুই না হয় কাল ফিরে আসবি।'

সুতনুকে কখন কোন কাজে আটকা পড়তে হবে ঠিক নেই। তার পক্ষে সিউড়ি ছেড়ে যাওয়া কঠিন। সে দুর্গাকে বুঝিয়ে ব'লতে চেষ্টা করে। দুর্গা ঈষৎ হতাশ হ'য়ে বলে,—'আমাদের গরীবের ঘরে কি আছে বল। তুই ব্যবসায়ী, ব্যস্ত মানুষ। আমাদের ঘরে গিয়ে তোর কি লাভ?'

সুতনু ওর হাত ধরে বলে,—'যখন বিনা নোটিশে হাজির হবো, তখন বুঝবি।'

সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময়ে দুর্গার জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সুতনুর বাবা তাকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর শান্তিনিকেতনে ভর্তি ক'রতে চেয়েছিলেন। খুব বেশি প্রতিযোগিতার জন্য সম্ভব হয় নি। সে বোলপুর কলেজে ভর্তি হয়েছিলো হোস্টেলে থাকতো। দু'বছর আগে সে বোলপুর কলেজ থেকে পাশ করেছে। তিন বছরের কলেজ জীবনে দুর্গার সঙ্গে তার দ্যাখা হবার সুযোগ কমই হয়েছে।

দুর্গা সুতনুকে নিজের সম্পর্কে যৎ সামান্য বলেছে কারণ সুতনু সব

সময় হাসিখুশি থাকে। সাধারণত তার কাছে এলে দুর্গা নিজের কষ্ট-গুলো ভোলার চেষ্টা করে। তাছাড়া, রাস্তায় অল্প সময়ের সাক্ষাতে সব বলা যায় না। সে লক্ষ করে যে সুতনু তার কষ্ট বোঝার চেষ্টা করছে। সে হালকা হবার জন্য বলে,—'বোনের বিয়ের পর থেকে বাবার সাথে আমার মিল নেই। অ্যাকটা ভালো পাত্রের খোঁজ আমরা পেয়েছিলাম। তার বাবা আমাদের প্রস্তাবে রাজি ছিলো। বোনের বিয়ে দেবার সুযোগ হাতছাড়া ক'রতে চাই নি।'

'সিউড়িতে আমাদের অ্যাকটা ঘর আছে, তুই জানিস। ঠাকুর্দা যখন ওই ঘর তুলেছিলো তখন আমাদের অবস্থা অনেক ভালো ছিলো। বোনের বিয়ের সময় ঘর বিক্রির কথাবার্তা হচ্ছিলো। বাবা সিউড়ির ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে মনে করে গাঁয়ে তিন বিঘে জমি বেচে দিলে। আমি চাকরি পেলে জমি আবার কিনে নেবে, বাবা ঠিক করেছিলো। যাকে জমি বেচেছিলো বাবা তাকে এই কথা বলেছিলো।'

'বাবা আজও বিশ্বাস করে, অ্যাকজন ইস্কুলে ভালো রেজাল্ট ক'রলেই চাকরি পেয়ে যাবে। অ্যামন না যে বাবা বেকার সমস্যার কথা জানে না। হিসেব করার সময় দেখবি নিজের কাল ধ'রে বিচার ক'রবে। রত্নাকর রেলে চাকরি পাবার পর থেকে বাবা এই কথা খুব বেশি করে বিশ্বাস করতে লেগেছে। তাই বাড়ির জন্য যতো করি, মন পাই না। অথচ কোথায় না অ্যাপ্লাই করেছি। প্রত্যেক দরখাস্তের সাথে পোস্টাল অর্ডার পাঠাতে বিরাট খরচা। অতো পয়সা পাবো কোথা?' দুর্গা বিষণ্ণ ভাবে বলে,—'আমি সৎ হয়ে বাঁচতে চাইছি, এই আমার দোষ রে।'

কলেজ জীবন শেষ হবার পর সুতনুর সঙ্গে দুর্গার ছ্যাখা হলে দুর্গা তার নানা ব্যক্তিগত দিক সম্পর্কে জানতে চাইতো। সুতনু এতে বিরক্ত হ'তো ও একে গ্রাম্য চরিত্রের দুর্বলতা বলে ধ'রে নিতো। দুর্গা সুতনুর বিরক্তিকে বিশেষ আমল দিতো না। এবার সুতনু অনুভব করে যে দুর্গা শুধু শোনার চেষ্টা করে না, নিজের কথাও বলে। ও একটু

ইতঃস্তত করার পর বলে,—'তোদের সিউড়ির ঘর অ্যাখন খালি না ভাড়া আছে?

দূর্গা—খালিই আছে। ক্যানো বল তো?

সুতনু—তোকে অ্যাকটা বুদ্ধি দিই। তোর বাবাকে বোঝা যে শহর এলাকায় থেকে খোঁজ না ক'রলে চাকরি পাওয়া যাবে না। আমাদের কাছ থেকে মাল নে. হোলসেল রেটে বিক্রি কর। পরিশ্রম আছে, তবে সরকারি চাকরির থেকে খারাপ হবে না। তোর পরের ভাই বাড়িতে থাকে না? সে কি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ ক'রলো?

দূর্গা—গত বছর দিয়েছে। পাশ ক'রতে পারে নি। পড়ায় ত্যামন মন নাই।

সুতনু— সে কি করছে?

দূর্গা—কিছুই না।

সুতনু—ঠিক আছে। ওকে কিছুদিন বাড়ির দায়িত্ব নিতে দে। তুই সিউড়ি চলে আয়।

কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকার পর দূর্গা বলে,—'তুই বলছিস এই করলে ভালো হবে?

সুতনু—আমি বলছি, এই-মাত্র। তুই কি করবি, সেটা তোর ব্যাপার। ছাখ, এতে তোর পোষায় কিনা। কাজটা কর। আমিও তোর সঙ্গে কাজ ক'রতে পারবো, তোর সঙ্গে সময় কাটাতে পারবো। তোর বাবাকে বলিস না যে আমি এসব বলেছি।'

দূর্গাচরণ ভাবে সে এই কাজ ক'রতে পারবে কি না। সে বলে,—'আজ না হোক, বাবা পরে জানতে পারবে। বাবার ঘরে থেকেই আমাকে ব্যবসা চালাতে হবে ধর।'

—সুতনু—'সে পরের কথা পরে। তখন তুইও কি এমনি থাকবি। অসুবিধা হলে ঘর ভাড়া নিতে পারবি।'

দূর্গা এবার হালকা ভাবে বলে,—'আমি এখানে আসলে তোর সব কথা শুনবো। তুই এড়িয়ে গিয়েছিস। বর্ণার ব্যাপার কি বিজনেস

সিক্রেসি নাকি ?'

সুতনু লজ্জা পায়,—'বল বল।' দুর্গার আন্তরিকতা ও বুঝতে পারে।

দুর্গা হেসে মন্তব্য করে,—'বর্ণা তোকে ভাগ্যবাদী বানালো আর তুই আমাকে। তুই যে আমাকে ব্যবসায়ী বানাতে চাইছিস।'

বাসে ভিড় বাড়ছে। দুর্গা বাসে ওঠে, বলে,—'ঠিক আছে, আবার ত্যাখা হবে।'

৩

এর কয়েকদিন পরে দুর্গা সুতনুকে চিঠি লিখে জানায় যে সে রেডি। ওদিকে বাড়ির নানা সমস্যা সামলাতে অ্যাক মাস কি আরও বেশি সময় পার হয়। সে অ্যাক সকালে সিউড়ি পৌঁছে সুতনুর বাড়ির দিকে রওনা ত্যায়। হঠাৎ ও কিছুদূরে সুতনুকে দেখতে পায়। সে সিউড়ি কোর্টের দিক থেকে আসছে, সম্ভবত দুর্গাকে দেখতে পায় নি। ও আরো এগিয়ে এলে দুর্গার মনে হয় সুতনুকে বিষণ্ণ ত্যাখাচ্ছে।

জিগগ্যেস না ক'রলে সুতনু নিজের সম্পর্কে সাধারণত কাউকে বলে না। তার মানে এই নয় যে ও সবাইকে অ্যাড়াতে চেষ্টা করে। দুর্গা জানে সুতনু চাপা প্রকৃতির। তর্ক বা হাসি-ঠাট্টা করার সময়েও সে নিজের সম্পর্কে কোনো কথা বলাটাকে অ্যাড়ায়। ব্যবসায়ীদের এরকম হ'তে হয়। বর্ণার সম্পর্কে অবশ্য সে লজ্জায় কাউকে কিছু বলে না। দুর্গা সুতনুর এই ব্যাপারটা ধ'রতে পারে না। সে ভাবে এও বুঝি সুতনুর চাপা স্বভাবের পরিচয় যদিও সে আগে এসব জিগগ্যেস করেছে। পরিবেশ স্বাভাবিক করার চেষ্টায় সে বলে,—'কিরে, পানকৌড়ির মতো ডুব দিয়েছিস। লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরছিস ? কোথা উড়ে বেড়াচ্ছিলি ?'

সুতনু—'খুব ব্যস্ত ছিলাম। তুই বলেছিলি তাড়াতাড়ি আসবি, এদিকে দু'মাস পার হ'লো।' যে এজেন্সীর জন্য সুতনু চেষ্টা করছিলো, সেটা ও পেয়েছে। দুর্গার কাছে কথাটা ও প্রকাশ ক'রলো না।

দুর্গা—উঃ। বাড়ীতে কি ঝামেলা। তুই আমার চিঠি পাস নি?

সুতনু একটু অবাক হয়। সে চিঠি পায় নি। সে বলে,—'তোর চিঠি পেলে সব ব্যবস্থা ক'রে রাখতাম। সত্যিই চিঠি দিয়েছিলি? অপদার্থ পোস্ট-অফিস জানছে কোথায় ওরা চিঠি পাঠিয়েছে।'

'যেতে দে। তুই অ্যাখন রেডি তো? আমি তোর সঙ্গে কাজ ক'রবো। সব 'মেক-আপ' হয়ে যাবে।'

সুতনু বন্ধুকে আন্তরিক ভাবে সাহায্য ক'রতে চেয়েছিলো, আবার নিজেদের নোতুন জিনিস বাজারে চালু করার উদ্দেশ্য তার ছিলো। দুর্গা অবশ্য সুতনুর ব্যবসায়ী সুলভ কৌশল ধ'রতে পারে নি। সুতনুর কিছু অ্যাকটা হয়েছে, ও সেটা প্রকাশ ক'রছে না। দুর্গা বলে,—'আমি অ্যাকটা কথা জিগ্‌গ্যেস ক'রবো। তোকে সত্যি কথা বলতে হবে। তুই সব সময় হাসিখুশি থাকিস। তো তোকে অ্যাতো শুকনো ছ্যাখাচ্ছে ক্যানো?'

সুতনু—সবাই বদলায়। আমি বদলাবো না? বয়স দিন দিন বাড়ছে, কমছে না।

দুর্গা—না হাসলে বাঁচবি কি করে? বর্ণার খবর বল।

রসিকতা হ'লে সুতনু এড়িয়ে যেতো। কিন্তু দুর্গার গলার স্বরে রসিকতার চিহ্ন নেই। সুতনু বলে,—'আবার ওর কথা তুললি?' দুর্গা কি কিছু অনুমান ক'রেছে? বোধহয় নয়। বর্ণার শেষ চিঠিটা অ্যাখনও সুতনুর পকেটে আছে। সে ভাবে, দুর্গাকে চিঠিটা ছ্যাখানো উচিত হবে কিনা।

দুর্গা বলে,—'চল, মাঠে বসি।'

সুতনু অ্যাড়াতে চেষ্টা করে,—'বেশিক্ষণ ব'সবো না। আমাকে তোর সঙ্গে যেতে হবে। অ্যাকবার বাড়ি যাবো।'

দুর্গা—আঃ। তুই সবধানে যাবি। আমার কাছে দশ মিনিট বস।

দুর্গা সুতনুর সঙ্গে দশ মিনিট ব'সতে পারলেই কথায় কথায় সব বের ক'রে নিতে পারবে। সুতনুকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। দুর্গা লক্ষ্যে

করে,—'আয় তোর হাত দেখি।' সে অল্পদিন হ'লো হাত ছাখা শিখেছে। সুতনু অ্যাখন অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। ওর আগ্রহ দ্বিগুণ হবে।

দুর্গা বেশি কথা না ব'লে মাঠে বসার জন্য সুতনুর হাত ধ'রে টানে। জানুয়ারি মাসে রোদ আরামদায়ক। দুর্গা সুতনুর পাশে ব'সে ব'লে চলে,—'তোর বৃহস্পতি ভালো। তোর হাতে অনেক কাটাকুটি রেখা আছে। সমস্যা, অশান্তি, শত্রুতা তোর জীবনে আসবে। যাহোক, তুই শেষ পর্যন্ত এর হাত থেকে বেরিয়ে আসতে পারবি। তোর রবি রেখা হৃদয় রেখায় মিলেছে। দুর্গা ঠাট্টার সুরে বলে,—'তুই যতোই চাপা ধরনের হোস, তুই লোক ভালো। তোর হাতে প্রেম-ভালোবাসা আছে।' দুর্গা ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়ে বলে,—'তোর কেসটা সোজা নয় মনে হচ্ছে। কি রে?

দুর্গা তাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারে। সেই জন্য সুতনুর ওর সঙ্গে সব আলোচনা ক'রবে মনে করে। ও একটু ভয় পায় পাছে দুর্গা ওকে জ্বালাতন করে। বর্ণার শেষ চিঠির লাইনগুলো ওর সামনে ভাসছে। চিঠিটা বার বার পড়ার ফল। সুতনু আবার ওভাবে ওটা দুর্গাকে ছাখাবে কি না। দুর্গার মুখোমুখি ব'সে সব খুলে বলা ওর পক্ষে কঠিন। শেষে সে চিঠিটা ওর হাতে ছায়। চিঠিটা এই রকম ··
'তুমি খানিকটা সেকেলে। মেয়েরা ভাগ্য মানতে পারে, ছেলেদের মানা উচিত নয়। আমি তোমার ভাগ্যে বিশ্বাস করাকে সমর্থন করি না, যদিও তোমাকে ভালোবাসি। প্লিজ রাগ করো না। আমি সত্যিই তোমাকে ভালোবাসি সেই জন্য তোমাকে এত কথা লিখছি। ভিতরে ভিতরে আমিও সেকেলে। তাছাড়া তোমাকে ভালোবাসবো কেন?

মনে ক'রতে পারো? আমি তোমাকে প্রথম তুমি বলেছিলাম। ওটাকে তুমি হয়তো ভালোবাসা ধ'রে নিয়েছিলে। আমি কাউকে তুই বলা পছন্দ করি না। শুনতে বাজে লাগে। আমি সবাইকে তুমি ব'লে ডাকি। আমি আমার ছোটো ভাইকেও তুমি বলি। বাবা

তুই বলা পছন্দ করেন না।'

'আমাদের কলেজ-জীবন শেষ হলো, সোনালী দিনগুলো ফুরোলো। আমার অভিভাবকরা বিয়ের জন্য চেষ্টা শুরু ক'রলেন। আমি পরিষ্কার না বলেছিলাম। আমার অন্য কোনো উপায় ছিলো না। তুমি ছাড়া কে বুঝবে, কেন আমি অমন ক'রেছিলাম। তুমি আমার জাতের নও। সেই জন্য তাঁরা তোমাকে মানতে চান না। ওরা স্ট্যাটাসের কথা ব'লেন। তোমার বাবা বিজনেস করেন, আমার কলেজে পড়ান এইসব। আমি জানি এসব মিথ্যা। আমি বাবা-মার ভণ্ডামি মানতে পারি না।

'আমি মাকে তোমার কথা ব'লেছিলাম, তিনি কান দিলেন না। মনে করেছিলাম 'তোমার সঙ্গে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে যাবো আর সই করবো। আমার অ্যাবদল বন্ধু সাক্ষী হ'তে চেয়েছিলো। তারপর দেখলাম আমি বাবা-মা'র সেন্টিমেন্টে ঘা দিতে পারবো না। যদি তোমার আমার মধ্যে পরে ভুল বোঝাবুঝি হয়? চারদিকে দেখে যা বুঝতে পারছি যতোক্ষণ ভালোবাসা, তাতোক্ষণ ভালো। বিয়ের পরেই ঝগড়া আর ভুল বোঝাবুঝি। সুখ নেই। মা বাবা সবাইকে ডেকে ডেকে ব'লবে—ওই দেখো বাবা-মাকে না মানার ফল! তুমি কি তাই চাও? ভালোবাসা আর বিয়ে এক নয়। আমার কপাল ভালো, চাকরি পেয়ে গেছি। আমি এই জায়গা ছাড়ছি। লেডিস হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করেছি কোলকাতায়। বাবা-মাকে ঠিকানা দিই নি যদি ওরা হোস্টেল কর্তৃপক্ষকে কান ভাঙানি দেয়। নিচের ঠিকানায় চিঠি লিখো। প্লিজ, লিখো...

সামাজিক ব্যাপারে দুর্গার বিশেষ আগ্রহ নেই তবু সে মেয়েদের কম বয়সে বিয়েকে সমর্থন করে। বিশেষত সেই সব মেয়েদের যার-তার মতো পরিবারে মানুষ। কম মানে আঠারো বছর। গ্রামগুলোর কি অবস্থা? যদি মেয়ে কোনো রকমে কুড়ি পার হ'য়ে যায় তাহলে তার পাত্র মেলা কঠিন। মেয়ের বাপকে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা খরচা

করতে হয়। সে খবরের কাগজে অনেক কিছু পড়েছে। কিন্তু মেয়ের বাবা-রা জানে বড়ো বড়ো শ্লোগান শুনতে ভালো। হৃদয়হীন এই সমাজে তা অল্পই কাজে লাগে। চুলোয় যাক। সে নিজে বাঁচলে যথেষ্ট।

সুতনু নীরবতা ভাঙে,—'যেতে দে। তোর সঙ্গে কথা ব'লে তোকে কাজ বুঝিয়ে দেবো।' ওর মাকে খবর দিতে হবে যে দুর্গা এসেছে। সে ওদের অতিথি। সুতনু তাড়াতাড়িতে বলে,—'ওঠ্, তোকে কয়েক-জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।' খুব সম্ভব সুতনু নানা কাজে জড়িয়ে বর্ণাকে না পাবার যন্ত্রণা ভুলতে চাইছে। দুর্গা অসচেতনে যেনো তার ইস্কুল-জীবনের স্থান ফিরে পাবার চেষ্টা করে। সে খানিকটা বক্তৃতা করার সুযোগ ছাড়ে না,—'বর্ণা ভুল ক'রছে। ও কি জানে না অবিবাহিতা মেয়েদের পক্ষে এই দেশ কতোটা নিরাপদ! ওর বাবা-মা চিরদিন বাঁচবে না। পরে কেউ ওর দিকে ফিরে তাকাবে না! অবিবাহিতা পুরুষদের জীবন কোনো রকমে কাটে। অ্যাকা মেয়েদের জীবন খুব কঠিন। ঘরের আকাঙ্ক্ষা মেয়েদের চিরদিনের।'

'ওকে বুঝিয়ে চিঠি লেখ। সে তোকে সত্যি ভালোবাসে। দরকার বুঝলে যা, গিয়ে ছাখা কর। যদি সত্যি ভালোবেসেছিস তোর ওর জন্য এই পরিশ্রম টুকু কর।'

'চেষ্টার ফল হবে কিনা,' সুতনু নিশ্চিত নয়। সে সাধ্য মতো চেষ্টা করবে। সে দুর্গার সঙ্গে আলোচনা করে।

দুর্গার লটারির টিকিট বেচে ব্যাড়ানো মেয়েটার কথা মনে পড়ে। সে বলে,—'আগে বিনা কারণে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিতো না।' সুতনু পাল্টা তর্ক করতে পারে! তাই ও আবার বলে,—'অল্প বয়সী স্বামী-স্ত্রীকে পরামর্শ দেওয়া অভিভাবকের দায়িত্ব। এতে ওরা নিজেদের সামলিয়ে চ'লতে পারবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এই রকমে

ক'মবে।'

সুতনু শিক্ষিতা মেয়েদের পক্ষে শিশুর ছ্যাখাশুনো করার সুবিধা, আঠারো বছর বয়সের পরে গর্ভধারণ স্বাস্থ্যসম্মত ইত্যাদি অনেক কথা বলতে পারতো। কিন্তু কিছু বলার আগ্রহ সে হারিয়েছে? তর্ক ক'রে কি হবে? যদি ভাগ্যে বিশ্বাসী হতো, তাহ'লে সে অ্যাতো পরিশ্রম ক'রতো না। বর্ণা প্রথমে এগিয়ে ছিলো, ও এই করলো!

# সম্পর্ক

প্রায় ব্যালা বারোটা। শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস। অ্যাক আধুনিকা আর তার মা। সম্ভবত আধুনিকা গল্প ক'রতে ভালোবাসে ও ইংরেজিতে কথা বলতে রীতিমতো অভ্যস্ত। মা শুনছে কি না শুনছে তা প্রায় গ্রাহ্য না করেই সে কথা ব'লে চ'লেছে।

এই ট্রেনে অন্যান্য গাড়ির তুলনায় ভিড় কম থাকে। এইদিন ভিড় আরো কম। কামরার অপরপ্রান্তে কয়েকজন। এদিকে মা, মেয়ে ও অপর অ্যাক যাত্রী ছাড়া আর কেউ ছিলো না। আধুনিকা কথা থামিয়ে পাশের যাত্রীকে জিগ্‌গ্যেস করে,—'দাদা শুনন।' এই ট্রেন বর্ধমানের পর আর কোথাও দাঁড়ায়?' যাত্রী ভাবছিলো শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে যাতায়াত ব্যয়-সাপেক্ষ। এছাড়া তার উপায়ও নেই। সে ব'লে,—'আমাকে বলছেন? গুসকরায় কখনো কখনো থামে।'

—ওর পর বোলপুর? ওটাই last stoppage?

—হ্যাঁ।

—If you don't mind—অ্যাকটা কথা জিগ্‌গ্যেস ক'রতে পারি?

—বলুন।

—আপনি শান্তিনিকেতনের student?

সহযাত্রী একটু অবাক হয়। আধুনিকা বলে,—'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে।'

—বেশ কয়েক বছর আগে ওখানে ছাত্র ছিলাম।

—আমাকে help করবেন?

—বলুন কি করতে পারি?

—আমি Child Psychology নিয়ে পড়ছি। Post-graduate-

এ। স্কুলে স্কুলে ঘুরে study করতে হচ্ছে। শান্তিনিকেতনের student-দের আপনি ক্যামন মনে করেন? ওরা কতোটা creative?

আধুনিকা ব্যাগ থেকে খাতা বের করে। তার উপরে নাম লেখা—রীণা দত্ত। যাত্রী বোঝে ওটাই ওর নাম। সে তার ঔদাসীন্য লুকোবার কোনো চেষ্টা না করে বলে,—'এর উত্তর দেওয়া—আমার পক্ষে কঠিন। আমি মাত্র তিন বছর ওখানে প'ড়েছি। তারপর বেশ ক'বছর সম্পর্ক নেই। শান্তিনিকেতনে যাঁরা পড়েন তাঁরা ভালো ব'লতে পারবেন।'

রীণা যাত্রীকে বাজিয়ে ছাখার চেষ্টায় ব'লে,—'তবু আপনার help দরকার। You are an ex-student of Shantiniketan and creative too.

সহযাত্রী আবার অবাক হয়। রীণা ইতিমধ্যে অনুমান করেছে যে এই যাত্রী মিশুকে প্রকৃতির কিন্তু শান্তিনিকেতনকে বিশেষ পছন্দ করে না। রীণা ব'লে চলে,—'একটু আগে আপনি কাগজ-পেন বের করলেন। Within five minutes you have kept it in your 'pocket আর absent-minded হয়ে গেলেন। লিখবার মতো কিছু পাচ্ছেন না। Am I correct?'

সহযাত্রী মৃদু হাসে কিন্তু রীণার কথা তার অহংবোধকে ছুঁয়ে যায়। রীণা বলে,—'আপনার বাড়ি গ্রামে?'

সহযাত্রী—'হুঁ'। একটু ইতঃস্তত করার পর যাত্রী জিগ্‌গ্যেস করে,—'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, কোনোদিন গাঁয়ে যান নি। কি ক'রে বুঝলেন?'

—How can I explain it—আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে। রুক্ষতা, সরলতার আরো অনেক কিছুর অ্যাকটা tital effect—পৃথিবীর সব দেশের গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে এটা পাওয়া যায়।

—গাঁয়ের বিদঘুটে ব্যাপার। শহরের সঙ্গে মেলে না। গাঁয়ের অধিকাংশ লোক কালচারের ধার ধারে না।

—It doesn't matter.

—আমার ঠাকুর্দার বাবা কবি ছিলেন। লক্ষ্ণৌ-এর নবাব তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন।

—তাই ?

Anyway, আপনি বেশ free আমি ভাবছিলাম, যদি কিছু মনে করেন।

—অ্যাকটা কথা জানতে চাইছি। যদি অভয় দেন তো বলি।

—বলুন।

—আপনার কথায়—মানে বাংলা উচ্চারণে ইংরেজির টান ক্যানো ?

—School-life আর college-life-এ আমি গোয়া, ব্যাঙ্গালোর-এ ছিলাম। সেই জন্য আমার কথা এই·রকম। Eightyfive-এ কোলকাতায় এসেছি। ক্যালকাটায় পড়ি।

৯-৪০-এ ট্রেন হাওড়া ছেড়েছে। এই যাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হবার পর মায়ের সঙ্গে বকতে ভালো লাগছিলো না। রীণা তাই আমাদের সঙ্গে শুরু করে,—'দেখবেন, বেশি curiosity ভালো নয়।'

—'Curiosity শুধু মেয়েদেরই থাকবে, ছেলেদের থাকতে পারে না ?' রীণা প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়,—'What the meaning of bidghute ? ugly ?

—না। Grotesque বলতে পারেন।

—Discredit, তাই না ? বাঙালি হয়ে বাংলা ভালো বুঝতে পারি না, প্রায় ছাপার মতো না হ'লে হাতের লেখা পড়তে পারি না। In fact, এ নিয়ে আগে অতো ভাবিনি।

—বেশ করেছেন। আপনি আঁতেলদের মতো নন। ওরা বাংলা ভাষাকে ঘেন্না ক'রে খুশি হয়। অ্যামন ভাব করে যেনো ইংরেজের চোদ্দ পুরুষ।

—Are you supporting me ? আমি আপনার opponent. School-life-এ বাপির সঙ্গে বাংলা Practice করেছি।

—আপনি খুব Simple অল্প পরিচয়ে আজকাল এই ভাবে কেউ

কথা বলে না। High-society-র কেউ অ্যাকবারে নয়।

সহযাত্রী রীণার মাকে কিছু বলতে গিয়েও সংযত হয়। কি বলে ডাকলে ভালো হয়, সে ঠিক করতে পারে না। মাসীমা ডাক হয়তো ইনি পছন্দ করবেন না। কিছু না বলাও অভদ্রতা। এঁর মনোভাব অনুমান করে রীণা মাকে বলে,—'Mummy, তুমি কিছু ব'লবে না?'

রীণার মা বলে, 'তুমি বলো, আমি শুনি।'

আপনি কিছু মনে ক'রবেন না। ও একটু talkitive কিন্তু innocent'.

রীণা 'Mummy'—

ট্রেন গুসকরা স্টেশনে অল্প সময়ের জন্য দাঁড়ায়। দু'জন ঝালমুড়ি-ওয়ালা, অ্যাকজন কফিওয়ালা ওঠে। বেশ কিছুক্ষণ আগে সহযাত্রীর খিদে পেয়েছিলো। সহজাত অতিথি পরায়ণতার বশে ও নিজেকে স্বাভাবিক দ্যাখাচ্ছে না ভেবে সে বলে,—'মুড়ি খাবেন? এই ঝালমুড়ি—তিনটে দেখি।'

রীণা—বাঃ। এ কি করলেন?

—বীরভূমে যাচ্ছেন, মুড়ি খাবেন না?

বীরভূমের গাঁয়ে গাঁয়ে মুড়ি হলো জলখাবার।

—Mummy, দেখছো? বলেছিলাম না, গ্রামের লোকরা খাওয়াতে ভালোবাসে।' রীণার মা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলো। মুখ না ফিরিয়ে সে বলে,—'তোমরা খাও।' তারপর মুড়ির ঠোঙা হাতে নেয়,—'মুড়ি আমরাও খাই।

রীণা—অ্যাকটা question আছে। জবাব চাই।

—জবাব চাই? শ্লোগান দিচ্ছেন?

—As you think it. High-society অপছন্দ করেন, তাই না? বলার সময় আপনার voice টা একটু অন্য রকম হ'লো। সহযাত্রী হাসে। রীণা আর একটু ঝুঁকি নিয়ে বলে,—'অ্যাতোক্ষণ যে আমার সঙ্গে গল্প-গুজব করলেন।'

—যাক, বুঝেছেন। আপনার আন্দাজ ঠিক নয়।

—তিন-sorry-চার হলো।

—মানে?

—ঠিক সময়ে বলা যাবে। রীণা হেসে বলে,—'you shouldn't discard true materialism. আমি—I mean, high-society-তে তারা এমনি ওঠে নি, অনেক পরিশ্রম করে পৌঁছেছে।

সহযাত্রী গত কয়েকদিন ধরে মনে যে ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিলো সেটা প্রকাশ করলো,—'না—মানে—তা নয়। আমি তা বলি না।' সহযাত্রী উপযুক্ত শব্দ হাতড়াতে হাতড়াতে বলে,—'অ্যাক ধনীর সন্তানকে ধনী হ'তে হ'লে কখনোই গরীবদের মতো পরিশ্রম করতে হয় না। ঘাম পরিশ্রম অনেক শুনেছি। কথাগুলো অ্যাক ঘেয়ে হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক উপায়ে যদি কিছু হয়, তবে ভালো। আমাদের মুসলিম সংস্কৃতিও একে সমর্থন ক'রবে। Materialism ইউরোপ-আমেরিকায় —কি বলবো, রক্তে আছে। ওদের কাছে ওটা স্বাভাবিক। ওদের দেশের বড়ো শিল্পপতিরা ইজ্জতের দোহাই পাড়ে না।

রীণা ইতিমধ্যে লক্ষ ক'রেছে যে এ সাধারণত বেশি কথা বলে না, কিন্তু একে উত্তেজিত করা কঠিন নয়। অ্যাকবার শুরু ক'রলে এ আবেগের সঙ্গে কথা বলে। এবার রীণা নিশ্চিত হয়।

—But you shouldn't count this way. ওদেশের গরীব আর এদেশের গরীব অ্যাক নয়। ওদের Problem অতো acute নয়।

—ঠিক। তবু আমাদের মানতে হবে আমরা ভারতীয়রা ওদের materialism ময়লা, ছেঁড়া ধুতির উপর দামি কোটের মতো চাপিয়েছি। তার জন্য অ্যাতো সমস্যা। বস্তুবাদের নাম আমরা অন্ধ ভাবে ভোগবাদকে অনুসরণ করছি। রীণা চা বা কফির জন্য তাকায়। সে ডাকে,—'এই কফি—তিনটে।' সহযাত্রী—কফি—

—ভয় নেই, জাত যাবে না। You won't be trapped into

high-society. অল্পক্ষণের মধ্যে ট্রেন বোলপুর পৌঁছয়। সহযাত্রী এদের নামতে সাহায্য করে। রীণা—টুরিস্ট লজ-এ বত্রিশ নম্বরে আসুন। আগামীকাল মঙ্গলবার। বিশ্বভারতী দুপুরের পর বন্ধ! তখন free থাকবো।

—মঙ্গলবার বিকালে আসার খুব চেষ্টা ক'রবো।

কিছুটা এগিয়ে যাবার পর রীণার মা ফিরে তাকায়। বলে—'Bye'.

২

সকালের দিকে মেয়ের খানিকটা কাজ হ'য়েছে। মিসেস নিশ্চিন্ত। ট্রেনে পরিচিত হওয়া ছেলেটা হয়তো আসবে। মনে হ'তে তার ভ্রূ কুচিত হলো। মেয়ের গায়ে পড়ে আলাপ করা স্বভাব। তা-ও ছেলেটা নিজেদের স্ট্যাটাসের হ'লে হ'তো। তার উপর arrogant টাইপের। মেয়ের অ্যাডভেঞ্চারের শখ হ'য়েছিলো। অ্যাকা আসলে কি ঝামেলা না বাধাতো।

বুকের ভিতর যন্ত্রণা অনুভব করে রীণার মা। বাবার আদরে মেয়ের বারোটা বাজলো। সব দোষ ওর বাবার নয়। অ্যাখনকার ছেলে-মেয়েরা তাদের বাবা-মায়ের নয়। ওরা নিজেদের ভালো-মন্দ বোঝে না। নইলে যার তার সঙ্গে মেশে? এদের সে বুঝতে পারে না।

রীণার মা বিছানায় শুয়ে অ্যাকটা ফ্যাশন--ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোচ্ছে। 'ত্বক রক্ষা' সম্পর্কে পড়ার পর সে 'বিদেশি নিরামিষ রান্না' দেখতে যায়, আলস্য বোধ হওয়ায় ম্যাগাজিনটা পাশে রাখে। মেয়ের ভাবনা আবার তার মন অধিকার করে। নিজের উপর সে বিরক্ত হয়। 'worthless' বলে পাশ ফিরে সে ম্যাগাজিনটা আবার হাতে নেয়। মেয়ে তার ভাবনাগুলো বুঝে ফ্যালে নি তো? মেয়ের কাছে ধরা পড়ার ভয়, হেরে যাবার ভয়—বড়ো ভয়। পাশ ফিরে সে মেয়েকে অ্যাক নজর দ্যাখে। না, ও ঘুমোচ্ছে।

৩

ঘুমটাকে ঝেড়ে ফেলে রীনা অ্যাকবার কাবু উল্টে ঘড়ি ছাখে। আগস্টের বিকেল। সাড়ে তিনটে। টুরিস্ট লজের দোতলার ঘরের জানলা দিয়ে অ্যাক টিলতে রোদ ঢুকেছে। ঘরে আবছা প্রতিফলিত আলো। গত দু-তিনদিন জোর বৃষ্টি হয়েছে। গরম বিশেষ নেই।

ভদ্রলোক সম্ভবত আসবেন। মনে হতেই রাণা উঠে পড়ে। মুসকিল মাকে নিয়ে। She always means me a green horn, এরা সরলতাকে বোকামি মনে করে।

আত্মবিশ্বাস রীণার আছে। মায়ের weak point কোথায় সে জানে। ওর মা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পড়তে বাবার সঙ্গে ভাব হয়েছিলো। মা society girl বলে নিজেকে ছাখায়। সেই জন্য এরা নিম্নবর্ণের কাছে অ্যাতোটা high-brow হয়ে পড়ে। মা বোঝে না অ্যামন subject আছে যে এই মনোভাব নিলে ভালো করে study করা যায় না। এরা নিজেদের past-টাকে মুছে দিতে চায় ক্যানো? How silly! মেয়ে না হয়ে ও যদি মা হতো? Mummy ম্যাগাজিনে ডুবে আছে। অ্যাখন বেরোনা ভালো।

মিনিট দশেকের মধ্যে ready হ'য়ে মাকে বলে;—'Mummy শান্তিনিকেতন যাচ্ছি। সেই ভদ্রলোক আসলে বসতে বলো।'

৪

রীণা প্রভাত সরণিতে দাঁড়ায়। টুরিস্ট লজের ঠিক সামনে এই রাস্তা। অতিরিক্ত রোদ অ্যাড়াতে ও কয়েক পা এগিয়ে অ্যাকটা গাছের আড়ালে যায়। Last কথাটা বেশ বলা হয়েছে। Mummy অতোটা alert হ'তে পারবে না। ওখানে পৌঁছনোর আগে ওঁর সঙ্গে ছাখা করা উচিত। কাজটা ঠিক হলো না। কথাটা directly বলতে হতো। না, অ্যাখনই যদি বলি, তাহলে ভদ্রলোককে হয়তো

খারাপ কিছুর মুখোমুখি হতে হবে যদি mummy-র সামনে যান।

সময় কাটতে চাইছে না। রীণা ঘড়ির দিকে তাকায়। আধ ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। Most probably ভদ্রলোক কোনো জরুরি কাজে আটকে গিয়েছেন। দেখে মনে হলো ইনি কথা রাখার চেষ্টা করেন। It's not reasonable to go back to the apartment. রীণা একটু অধৈর্য হ'য়ে পড়ে। দু'মুখো রাস্তা, ভদ্রলোকে কোনদিক থেকে আসবেন, ঠিক নেই।

৫

ওখানে না গেলে ভালো হয়। ওঁর মা পছন্দ ক'রছিলেন না। ইনি চমৎকার। স্টেশন ছাড়ার সময় ওই ভদ্রমহিলা প্রায় অ্যাকটা কথাও বললেন না। ইনি সম্ভবত অপেক্ষা করবেন। তাই সময় করতে হলো। না আসার কথা ভাবতে খারাপ লাগে। পরে ছাখা হবার সম্ভাবনা নেই। এইভাবে ইতস্তত করতে করতে পূর্ব-বর্ণিত যাত্রী বাস দাঁড়ানোর জায়গায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে ও শেষে প্রভাত সরণিতে পৌঁছয়। সে রীণাকে দেখতে পাবার মাত্রই বলে,—'বড়ো দেরি ক'রে ফেললাম।

—আমি ভাবলাম, আপনি আসবেন না। না এলে মজা ছাখাতাম।

রীণার মফঃস্বলের মেয়েদের মতো হাবভাব দেখে সে অবাক হয়,—'বিশ্বাস করুন, অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পর বোলপুরের বাস পেলাম।'

রীণা আমার সঙ্গে আসুন বলে বিচিত্রা সিনেমার কাছে এসে বাদাম ভাজা কেনে। উভয়ে পূর্বপল্লীর রাস্তা ধরে। যুবক আন্তরিক ভাবে রীণাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু ক'রে নিজের মতামত প্রকাশের ইচ্ছায় শেষ করে,—'রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন অন্যরকমের ছিলো। খোলামেলা অথচ কতো নিষ্ঠা। সেখানে লেখক-শিল্পীদের সৃষ্টিশীল মন সহজে বিকাশিত হতো। ইউনিভার্সিটির ঘেরা টোপ,

ডিগ্রি, পদের মোহ, বড়োলোকী চাল, কৃত্রিমতার মধ্যে অ্যাখন কি তা সম্ভব? তবু এখানে শিল্পে নিবেদিত প্রাণ কয়েকজন আছেন। তাঁদের তুলনা মেলে না।'

—আমার মনে হয় কোলকাতা, বর্ধমানের তুলনায় বিশ্বভারতী ভালো। ওগুলোতে result বেরোবার ঠিক থাকে না, ভালো পরীক্ষা দিয়ে ফেল করলেও আপনার কিছু করার নেই। খারাপ পরীক্ষা দিয়ে ভালো result হ'লে অবাক হবার কিছু নেই। বিশ্বভারতীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয়, অন্য ইউনিভার্সিটিতে হয় না।

—আপনি শঙ্খ ঘোষের 'কবিতার মুহূর্ত' বইটা প'ড়েছেন? অ্যাকটা গরীব সরল ছেলে এখানে পড়তে এসেছিলো। সে ক্লাসের ছেলেদের আর বেশি ক'রে মেয়েদের বিদ্রূপের শিকার হতো। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫শে বৈশাখে সে আত্মহত্যা ক'রলো। শঙ্খ ঘোষ তাঁর বই-এ এরকম লিখেছিলেন। এই নিয়ে তিনি কবিতাও লেখেন। যতোদূর মনে পড়ে, উনি সে সময়ে এখানকার অধ্যাপক ছিলেন।

—Is it so? আপনারা এখানকার ছাত্র ছিলেন, protest করতে পারে নি?

—আমি নিজে প্রতিবাদ করেছিলাম, কোনো ফল হয়নি। আমি শুধু অ্যাকজন ছাত্র ছিলাম, আমাদের মধ্যে অ্যাকতা ছিলো না। আপনি ভালো করে জানবেন, এই অবস্থায় কি করে অ্যাকজনের জীবন নষ্ট হয়। আমাকে অ্যাখনও বুঝতে হচ্ছে।

রীণা অস্ফুটে বলে,—'Really? জানতাম না।'

'আমি খবরের কাগজে পড়েছি, লোকের মুখে শুনেছি যে অ্যাখন সব জায়গায় deca-dence ছাখা যাচ্ছে। বিশ্বভারতী কি করে তার বাইরে থাকবে। আমি এই মতের বিরোধী। এই হলো নিজের weakness-কে চাপা দেবার চেষ্টা। নিজেকে rectify করার ইচ্ছা এই রকম করে চলে যায়।'

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটে। হঠাৎ সেই যাত্রী যুবকের মনে পড়ে,
সে বলে,—'ট্রেনে তিন সরি-চার বলছিলেন…

—হিসেব রাখছিলাম। ক'টা ইংরেজি শব্দ বলেন, তার।

উভয়ে হাসে।

যুবক—গ্রাম আপনার ভালো লাগে?

—গ্রাম সত্যি সুন্দর, কিন্তু বর্ষায় খুব কাদা।

তখন আমি খুব ছোটো ছিলাম। অ্যাকটা গ্রামে—towards বারুইপুর—আমরা গিয়েছিলাম। গরুর গাড়ির পিছন উঠে পড়ে ছিলাম। আমার মতো আরো অনেক ছেলেমেয়ে উঠে ছিলো। Driver-টা বকলো। আমাদের খুব মজা হলো।

তারপর বাপি বদলি হলেন। আমরা গোয়া গেলাম। আমি আমার মায়ের থেকে আলাদা। আমি বাবার মতো।

—'কি অদ্ভুত। আপনি অ্যাতো বিপরীত। অল্প পরিচয়েই নিজেদের মনের কথা আমরা খুলে ব'লতে পারছি। যাদের সঙ্গে অনেক বছরের পরিচয় আছে তাদের সঙ্গে কথা বলার সময়েও আমি অ্যাতো free হ'তে পারি না।' যাত্রী আবেগে কথা ব'ললেন বটে, কিন্তু বাড়িয়ে বলা হ'লো।

—এটা অ্যাকটা coincidence, Let it go. Incidentally কোনো দিন প্রেমে পড়েন নি?

যুবকটি এমনিতে সুপ্রতিভ, তা'হলেও মাত্র অ্যাকদিন কি দু'দিনের পরিচয়ে অ্যাক তরুণী অ্যামন প্রশ্ন করেছে। গ্রামের ছেলের পক্ষে এর জবাব দেওয়া কঠিন। সামলাতে সময় লাগছে।

বীণা—Please don't mind—আমি গ্রামের মানুষদের জানতে চাই।

যুবক কোনোভাবে ব'লে ফেললো,—'আপনার উত্তরটা আগে শুনি।'

—আমার দিকে কেউ কেউ এগিয়ে ছিলো। আমি এগোই নি।

মনে হয়েছে, ওদের সঙ্গে আমি adjust ক'রতো পারবো না।

তবে school-life-এ মজা অনেক ক'রেছি। য্যামন ধরুন, co-education-এ পড়তাম। আমরা Intermediate এর student ছিলাম। ছেলেরা লুকিয়ে আমাদের টিফিন খেয়ে ফেলতো। আমরা জানতাম ওই বয়সের ছেলেরা লাজুক হয়। কাউকে অ্যাকা পেলে কয়েকজন ঘিরে ফেলতাম। হয়তো সে কিছুই বলেনি। আমরা তাকে বলতাম—কথা দিয়ে ছিলে খাওয়াবে। এবার খাওয়াও। খুব জব্দ হ'তো ওরা।

যুবকের সংকোচ কাটে। সে ব'লে,—'গাঁয়ে ওসব সুযোগ বড়ো ছিলো না। শহরে যদি বা এলাম তো মনে করতো গেঁয়ো, আমরা ওদের মনে করতাম ন্যাকা। অ্যাখন অনেক পাল্টে যাচ্ছে।'

—মা ন্যাকামি করে, সেই জন্য মায়ের সঙ্গে আমি adjust ক'রতে পারি না।

যুবক সচকিত হয়। এই মেয়ে women's lib-এর ধ্বজাধারী। পাশের গ্রামের কয়েকদিন আগের ঘটনা ওর মনে পড়ে। অ্যাক দজ্জাল বউ প্রতিদিন তার স্বামীকে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে ব'লতো, আমি কাগজে লিখে দিয়ে যাবো। তুই জেলে পচে মরবি। শেষে নিরীহ স্বামী গলায় দড়ি নিলো। সে তার লাশটা দেখেছিলো।

—কি ভাবছেন? কোলকাতায় আসুন না। বাপির সঙ্গে আপনাকে introduce করিয়ে দেবো। আপনারা কি বলেন—উনি শিবের মতো।

যুবক চারিদিকে তাকায়, বলে,—'যদি ফিরতে না হতো, কি ভালো হ'তো। না গেলে যে last bus পাবো না।'

ঠিকানা দেবেন না?'

উভয়ে উভয়কে ঠিকানা ছায়। রীণা দত্ত। কোলকাতা—১৯, মহঃ বদরুদ্দোজা, গ্রাম ও ডাক :—যোহিতপুর, বীরভূম।

রীণা—চিঠি দেবেন। উভয়ে হাসে।

# আলোমতি—চন্দনপুর কথা

## ‘এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে’—সুকান্ত ভট্টাচার্য

### পোড়াকপালি কাণ্ড

সেবার আলোমতি সাগরভাসা পালা চন্দনপুরে হচ্ছিলো, তখন ও হয়েছিলো। সেই থেকে ওকে সকলে আলোমতি ব’লে ডাকতো। লম্বা চুল, সুন্দর চোখ—কোনোটার অভাব ওর ছিলো না। শুধু তার গায়ের রঙ কালো আর গড়ন লম্বা।

তখন ওর বয়স বছর নয়েক। মিষ্টি গলা শুনে কড়া বাগদি ওকে প্রায় কোলে তুলে কেষ্টযাত্রায় নামাবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলো। বেশ নাম হ’লো। বছর খানেক অভিনয় করার পর কড়া ওকে রাধার ভূমিকায় নামালো। অচিন্ত্য কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় ক’রতো। আলোমতিকে কেষ্টযাত্রার দল ছাড়তে হ’লো। বাপ-মা ওকে দল থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলো পাছে ওর বদনাম রটে। কিন্তু অভিনয়ের নেশা আলোমতিকে ছাড়বে ক্যানো ?

১৯৭২। আলোমতির বয়স তখন বারো-ত্যারো। বাড়ন্ত গড়নের মেয়ে। অচিন্ত্য তার থেকে ছ’-সাত বছরের বড়ো। এই সময়ে অচিন্ত্য বোলপুরে তার আত্মীয়ের বাড়িতে অ্যাক মাস কাটিয়ে এলো। ফিরে আসার পর তার মুখে ঘুরে ফিরে ধর্মেন্দ্র-বিনোদখান্নার নাম আর ডায়লগ শোনা যেতো। পরণে বেলবট্স্, চকরা-বকরা হাওয়াই শার্ট, চোখে হিরো মার্কা সান-গ্লাস।

অ্যাকদিন সকালে আলোমতি রাজু ঘোষের দোকানে আলু আর নুন কিনতে গিয়েছে। অচিন্ত্য দরজায় দাঁড়িয়ে। সে সিনেমার হিরোর ঢঙে চোখের বিশেষ কায়দায় আলোমতিকে ইঙ্গিত ক’রলো। আলোমতি এই জাতীয় ইঙ্গিতের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয়। নারী প্রবৃত্তি দিয়ে সে বুঝতে পারলো এটা কি। ও কোনোরকমে ব’ললো,

—'তুমি কি রকম লোক বটো গো? অচিন্ত্য তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলো,—'আমার চোখে জয়বাংলা হয়েছিলো। ঠিক হ'য়ে গেছে। সেই থেকে আমার অমন হয়।'

পরদিন থেকে ঘটনাটা মুখে মুখে ছড়ালো। এর কয়েকদিন পরে গুরুপদ বহড়া আলোমতির বাবা হরি মিস্ত্রির বাড়িতে যেনো উকিলের নোটিশ নিয়ে হাজির,—'কোথা এর কি বিচার ক'রলে বলো। আমাদের ঘরে বয়সের মেয়ে আছে। তাদের বদনাম হবে।' গুরুপদ গাঁয়ের অ্যাকজন মুরুব্বি, পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বয়স। সে পয়সাওয়ালা লোক। তার মেয়ে পূর্ণিমা আলোমতির দু'ক্লাস উপরে প'ড়তো। তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিলো। সেজন্য গুরুপদ চিন্তিত হয়েছিলো। পূর্ণিমার মা ক্ষেমঙ্করী নিজের মেয়েকে বাঁচাবার জন্য গালাগালি দিতে শুরু ক'রলে,—'একালে হলো কি? জাত বংশের দাম নাই কো? ব্যাটা ছুতোর, উবা আর কি করবে। তাই বলে অচিন্ত্য বাউরির সাথে!' আলোমতির সুনামের জন্য অনেক মেয়ে তাকে ঈর্ষা ক'রতো। তারা দেখলো, এ-ই সুযোগ।

ক্ষেমঙ্করী বড়ো ছেলেকে চাকরি করিয়ে দেবার জন্য স্বামী গুরুপদকে ব'লে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দেবার বন্দোবস্ত করেছিলো। সে আরোও ব'ললে,—'নটি, অনেক নাম কুড়োইলি। তোর চোদ্দ পুরুষের লেগ্যে কি করছিস কর। তুর বে দিতে উদের ভিটে-মাটি বাঁধা দিতে হবে।' হরি মিস্ত্রি অ্যাকটা বড়ো পিতলের হাঁড়ি ক্ষেমঙ্করীর কাছে বাঁধা দিয়েছিলো। শেষের কথায় তার ইঙ্গিত ছিলো। ইঙ্গিত মাত্র, কারণ নকশালদের ভয়ে এই কারবার গোপনে চালাতে হ'তো।

পরেশ ময়রা আর অ্যাক মুরুব্বি। তার বয়স প্রায় ষাট। ওর বউ দু'তিন বছর আগে মারা গিয়েছিলো। সে আলোমতিদের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করলো ও ইশারায় নিজের কামনার কথা জানাবার একটি সুযোগও ছাড়লো না। তার অপ্রত্যাশিত ভালো ব্যবহারে আলোমতির বাপ-মা ভুলে গ্যালো। তারা এসব নজর

ক'রলো না।

আলোমতি রান্নাশালে রান্না করছিলো। অতিথি এসেছে, তারা খাবে। পরেশ ময়রার ব্যবহারে তার মনের অবস্থা ভালো নয়, সে বিপর্যস্ত। ভাত একটু বেশি সিদ্ধ হ'য়ে গ'লে গিয়েছিলো। ওর মা ঘরে নানা কাজ সারছিলো, অ্যাকবার এসে ভাত দেখলো। সে প্রায় চিৎকার ক'রে ফেটে প'ড়তে যাচ্ছিলো, এই সময়ে আলোমতিকে যারা দেখতে এসেছিলো তাদের সঙ্গে হরি মিস্ত্রির কথাবার্তা বারান্দার ওধার থেকে তার কানে এলো। সে আলোমতির কাছে গিয়ে ব'ললো, —'নটি, তু যা, গাঁ ঘুরে বেড়াগা। উ অ্যাকবারে শেষ ক'রে দিলে রে' তার মা হতাশায় গ'লার স্বর নামিয়ে কথাটা বললো বটে, তবু প্রায় চাপা গর্জনের মতো শোনালো। আলোমতি উনুন থেকে তরকারির কড়াই নামাচ্ছিলো, হাত ফস্‌কে গ্যালো। খুব বেশি পুড়ে যাবার জন্য সকলে ওকে হাসপাতালে দিয়ে আসে।

### অচিন্ত্য কাণ্ড

নিজের কাজে অচিন্ত্য হকচকিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তার সঙ্গিরা উৎসাহিত। অচিন্ত্য তাদের গুরু। তারা তেঁতুল গাছের নিচে ব'সে রকবাজি শুরু করলো এবং আশপাশের গাঁ থেকে অরবিন্দ স্মৃতি জুনিয়র হাই স্কুলে প'ড়তে আসা মেয়েদের জ্বালাতে শুরু ক'রলো। মতি নামে ওদের অ্যাকজন অ্যাকটা দোকান চালু করে। সে পান, বিড়ি, চানাচুর, নানা রকমের বিস্কুট, লজেন্স আর মনোহারী জিনিস বিক্রি ক'রতো।

পূর্ণিমা দেখতে সুন্দর। স্বভাবত সে তাদের লক্ষ্য। প্রথমে তারা ইতস্তত ক'রছিলো। ওর বাবা প্রভাবশালী মুরুব্বি। শীঘ্রই তারা বুঝতে পারলো যে মেয়েরা সাহস ক'রে তাদের বাড়িতে বলে না। অ্যাকদিন পূর্ণিমা ইস্কুলে যাচ্ছিলো। তার চটির ফিতে ছিঁড়ে গ্যালো। মুজিবর নিজেকে সামলাতে না পেরে ব'লে বসলো,—'কার পিঠে চপ্পল

পড়বে?' অচিন্ত্য ব'ললো,—'বলো তোমার স্বামীর পিঠে। চটি আমাকেই কিনে দিতে হবে। বাটার না ফুটপাথের, কোনটা দেবো?'

পূর্ণিমা আর আলোমতি অ্যাক নয়। সেজন্য চন্দনপুর আর মদনপুরের মুরুব্বিরা গাঁয়ের বিচার ডেকে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিলো। অনেকে পিছন থেকে মুরুব্বিদের সমর্থন করলো। যারা নিয়মিত শহরে যেতো তাদের কাছ থেকে এরা শহরের ছেলেদের গল্প শুনেছিলো। অচিন্ত্য আর তার সঙ্গিদের দেখে তারা ক্ষুব্ধ। ইতিমধ্যে সম্ভবত নকশালরা মদনপুরে অসিত ঘোষের বাড়ীতে বন্দুক ছিনতাই ক'রলো। গুজব শোনা যাচ্ছিলো যে অচিন্ত্যকে তাদের সঙ্গে ছাখা গিয়েছে। মুরুব্বিদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হ'লো। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? গাঁয়ের লোকদের বিশ্বাস, পুলিশেও নকশালদের কিছু ক'রতে পারে না। অচিন্ত্য ঘর ছাড়লো। কেউ বললো সে এলাহাবাদে আছে। গাঁয়ের অ্যাকজন গয়া থেকে ঘুরে আসার পর ব'ললো যে সে তাকে ওখানে দেখেছে। চন্দনপুর থেকে চার কিলোমিটার দূরে শাহাপুরে দু'টো খুন হ'তে সি. আর. পি. ক্যাম্প ব'সলো। তাদের ভয়ানক মুখ চোখ দেখে গাঁয়ের লোকেরা আতঙ্কিত। তারা জানতো না কে কোন কথা কি ভাবে নেবে বা কে নকশালদের খবর দিয়ে দেবে। আলোমতি কয়েকবার সি. আর. পি.-দের দেখে-ছিলো। মাঝে মাঝে হই চই শোনা যেতো নকশালরা পশ্চিমের মাঠ পার হয়ে আসছে অচিন্ত্য তাদের মধ্যে আছে।

পূর্ণিমার বাবা-কাকারা তিন পরিবার। তারা আলাদা কিন্তু অ্যাকই উঠোন ব্যবহার করতো। চন্দনপুরের মধ্যে দিয়ে কাঁচা রাস্তা। তার পাশে তাদের মুদিখানার দোকান ছিলো। পূর্ণিমার বাবা নিজেদের বাগান ঝাঁট দিতো, শুকনো পাতা বস্তায় ভর্তি ক'রে বাড়ী নিয়ে আসতো আর মা মুড়ি ভাজতো। দোকানে ওই মুড়ি বিক্রি হতো। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে গাঁয়ে খুব অভাব। তখন ওরা অ্যামন কী অ্যাকসের মুড়ির বদলে একটি কাস্তে বন্ধক রাখতো।

অ্যাক রাতে তিন পরিবার খাওয়া সারছে, এই সময় দূরে হই-হুল্লা। ওদের বন্ধকী কারবার, ভয় ছিলো। তারা সব কটা লণ্ঠন নিভিয়ে দিলো। একটি কি দুটি কেরোসিন ল্যাম্প মিটমিট ক'রে জ্বল ছিলো। অনেকে খাওয়া শেষ করার সুযোগ পেলো না। সে কী অন্ধকার আর হুড়োহুড়ি। পূর্ণিমার ঠাকুমা খেতে বসেছিলো। বয়স্কা মানুষ, ভালো ক'রে হাঁটতে পারতো না। তবু সে প্রায় লাথি মেরে পিড়িটাকে সরিয়ে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নিলো। গুরুপদ তাড়াতাড়ি সুশান্তকে ডেকে তার কানে কানে কোদাল কাস্তে ইত্যাদি পাশের পুকুরে নামিয়ে দিতে ব'ললো। মিনিট দশেকের মধ্যেই বাড়ি ফাঁকা। তিনটি পরিবারের সতেরো জন তিন ভাগে হয়ে গ্যালো। গুরুপদ আক্রমণ বা নজর অ্যাড়াবার জন্য অনেকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এদের ভাগ ক'রে দিয়েছিলো। কয়েক মিনিট ইতস্তত ভাবার পর পূর্ণিমার বাবা দলবল নিয়ে সোনা বাউরির কুঁড়ের দিকে এগোলো। মেয়েদের অনেকে তার দলে। তাদের কেউ অসতর্ক হ'য়ে ব'লে ফেললো যে রাতে তারা খাওয়া শেষ করতে পারেনি। গুরুপদ অবশ্য আগেই একথা ব'লতে নিষেধ করেছিলো পাছে এই নিয়ে গাঁয়ে আলোচনা হয়। প্রথমে সোনা বাউরি ইতস্তত ক'রছিলো। ময়রারা উঁচু জাত। তারা হাঁড়ি-বাউরি-ডোমদের ছোঁওয়া জিনিস খায় না। এদিকে অভুক্তদের সামনে খাওয়া কঠিন। শেষে সে ব'লে ফেললো, 'গরীবের ঘরে চাট্টি খাও।' গুরুপদরা রাজি না হ'লে সে আবার বলে,—'তুমরা শুখ্যে থাকবে, আমরা কি করে খাবো গো? তুমরা অতিথি নারায়ণ বটো।' সোনা বাউরি উঠোন থেকে কলাপাতা কেটে ধুয়ে সুশান্তর স্ত্রীর হাতে গ্যায়, ভাত বাড়তে বলে। গুরুপদর সব থেকে ছোটো ভাই প্রশান্ত বাকি মেয়ে-বাচ্চাদের নিয়ে নসিবদের বাড়িতে উঠলো। পূর্ণিমার দুই দাদা, কিশোর-যুবকরা সুশান্তর সঙ্গে যায়। তারা গাঁয়ের পূবদিকে আখের খেতে নামে। ক্ষেতের অপরদিকে কোনো প্রাণী নড়াচড়া করছিলো। খড়খড় শব্দ।

কেউ ভীত স্বরে জিগ্‌গ্যেস ক'রলো,—'কে বটে গো?' অ্যাকটা পাখি উড়ে গ্যালো। অ্যাকজন বেরিয়ে আসলো। সে আব্দুল করিম, সি. পি. এম. নেতা। বেরিয়ে আসার আগে সে বুঝেছিলো যে ওরা সুশান্ত বহড়া—গোঁড়া কংগ্রেসী। গত কয়েক বছর রাজনৈতিক কারণে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিলো না। এই ঘটনার পর গুরুপদ অনেক বন্ধকী গয়না আর পিতল-কাঁসার বাসন ফিরিয়ে দিয়েছিলো। চন্দনপুরের হিরোরা তখন লোকচোখের আড়ালে পাছে নকশালরা তাদের তাড়া করে বা তারা পুলিশের নজরে পড়ে।

## চন্দনপুর কাণ্ড

তিন মাস পরে আলোমতি সুস্থ হ'লো। বছর দুয়েক কাটলো। তার বিষণ্ণ চেহারায় বিপর্যয়ের দূর আভাস পাওয়া যেতো। সে বুঝতে পারছিলো মানুষ আগের মতো খোলামেলা নেই। নকশাল আমলের আগে হবি মিস্ত্রির দূর সম্পর্কের ভাই কার্তিক রেডিও কিনেছিলো। দু-তিন হাত ফেরতা। সে অ্যাকদিন ঘরের বাইরে রেডিও নিয়ে গেলে কেউ মন্তব্য ক'রেছিলো,—'এঃ বাবু হয়্যেঁ গেইছে। যা, টাউনে গে থাকা।' এরপর থেকে সে নিচু স্বরে ঘরের মধ্যে ওটা বাজাতো।

দুর্ঘটনার পর আলোমতি অ্যাক বিছানায় পড়ে থাকতো। স্মৃতি তাকে যন্ত্রণা দিতো। সময় কাটতো না। একাকীত্বের জন্য আরো এই রকম হ'তো। কেষ্ট যাত্রায় নামার আগে সে টাইফয়েডে ভুগেছিলো। অনেকে তাকে দেখতে আসতো। তাদের ব্যবহার স্নেহ-ভালোবাসায় ভরা। নেপাল বাউরির মায়ের কথা তার মনে পড়তো। পরবর্তী সময়ে সে বেঁচে নেই। ছোটো ছেলেমেয়েরা তাদের খুড়ি, জেঠি বা মায়ের সঙ্গে আসতো। তারা অ্যামন ভাবে ওর দিকে তাকাতো যেনো সে অ্যাকটা অদ্ভুত জীব। কতো কান্না তার ভিতরে। কিন্তু নিঃসঙ্গ মুহূর্তে তার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জলমাত্র বেরিয়ে আসতো।

চন্দনপুরের নোতুন রেশন দোকানের মালিক রামরতন দে বোলপুর থেকে ফেরার পথে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে আনন্দবাজার পত্রিকা লাগিয়ে নিয়ে আসতো যাতে সকলের চোখে পড়ে। তার টাকা হয়েছে, অতএব টাকা সে ছ্যাখাবে।

ওই এলাকায় তখন গুরুপদদের দোকানটাই অ্যাকমাত্র বড়ো দোকান। তার ছোটো ছেলে দোকান ছ্যাখাশুনো ক'রতো। সে কার্তিক মিস্ত্রির রেডিও অল্প দামে কিনলো। ও জোরে জোরে বাজাতো, কারো মন্তব্যের ধার ধারতো না। রামরতনের ছ্যাখাদেখি সে যুগান্তর রাখছিলো। ১৯১৫ সালের জরুরি-অবস্থার খবর গাঁয়ের লোক পড়লো, জানলো। তারা মাঠের মধ্য দিয়ে ইউনিফর্ম পরা লোকজনকে যাতায়াত ক'রতে দেখলে ভীত ও সতর্ক হতো।

রেডিও, খবরের কাগজ। ১৯১৫-এর শেষভাগ অর্থাৎ কোলকাতায় টেলিভিশন এসেছে। চন্দনপুর পৃথিবীর অস্থিরতার সঙ্গে অনিবার্য ভাবে জড়িয়ে পড়লো। নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে য্যামন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের আর সর্বগ্রাসী রাজনীতির যোগ।

মতির মনোহারী দোকানের পাশে বাইরে থেকে অ্যাকজন এসে অ্যাকটা চায়ের দোকান খুলেছিলো। কোথায় যে তার বাড়ি ঠিক নেই। নিজের ব'লতে তার কেউ নেই। বউ ছেলে নাকি অনেকদিন আগেই অসুখে গত হয়েছে। অতএব, সে দায়মুক্ত। ভালো চপ বানাতো ব'লে লোকে তার নাম দিয়েছিলো চপু।

কিছু আড্ডাবাদ লোক চিরকালই আছে, কোনো কিছুতেই যাদের আড্ডা বন্ধ ক'রতে পারে না। চন্দনপুরেও এই ধরনের দু'অ্যাকজন ছিলো। তারা রামরতনের দোকানে খবরের কাগজ পড়তো, গুরুপদর ছোটো ছেলের রেডিও শুনতো আর অ্যামন ভাবে দেশ-বিদেশের কথা আলোচনা করতো যে তারা যেনো সবজান্তা। গুরুপদ খুব বিরক্ত হতো, বলতো,—'খেয়ে দেয়ে কাজ নেই কো, চটুইগুলার কিচির-মিচির হয় ছ্যাখো।' 'কেমন বটে ছ্যাখো।' এসব মন্তব্য অবশ্য সব-

জাস্তাদের শ্রোতাসংখ্যা কমাতে পারেনি। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো— এডিও তুরই ব্যাটা চালাইছে ছাখ গা।'

## অন্তর্দহন কাণ্ড

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে পূর্ণিমার বিয়ে ঠিক হবার খবর আলোমতির কানে পৌঁছিলো। তার বিয়ে? সে লম্বা, কালো। কে তাকে বিয়ে করবে? অনেকে, দেখতে আসার পর বলতো,— 'চিঠিতে জানাবো।' ব্যস, ওই পর্যন্তই। তারা চিঠি দিতো না, খবরও ক'রতো না। যারা বেশি পণ পাবার আশায় কথাবার্তা চালাতো, তারাও আলোমতির ঘটনা জানতে পারতো। অভিনয় ক'রতে পারলে আলোমতি এই যন্ত্রণা কাটিয়ে উঠতো। যে কেষ্টযাত্রার দলে ও ছিলো, কেউ সেই দলের বইটাতে বিখ্যাত গানটা জুড়ে দিয়েছিলো,—'বনমালী তুমি, পরজনমে হইও রাধা।' আলোমতি অ্যাকা থাকলে গানটা গাইতো! যদি বনমালী অর্থাৎ কৃষ্ণের মতো স্বামী তার হ'তো। সে-ও কালো। হয়তো সে ওকে পছন্দ ক'রতো। কৃষ্ণ মানে যে অচিন্ত্য! নিজের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হতো এরা তার ঘাড়েও তিনগুণ বদনাম চাপিয়ে দিয়েছে। সে যে কোথায়! না বাবা কৃষ্ণের মতো স্বামী তার দরকার নেই। ও শুধু কষ্ট ছায়। হাঁটতে সক্ষম হ লে সে—আঃ! ধানক্ষেতে দেবার বিষ তার হাতের কাছে! কি করে নিজেকে সামলালো সে জানে না।

পূর্ণিমার বিয়ের আয়োজন শুরু হলো। আলোমতিও অ্যাকজন নিমন্ত্রিত। সে জানতো পাছে কেউ কিছু ব'লে তাই তাকে নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছে। অ্যাকেবারে পাশাপাশি বাড়ী যে! প্রথমে ভাবলো সকলে বিয়ে বাড়িতে গেলে সে ভাত আলুসিদ্ধ নিজ হাতে ক'রে নেবে, ও বাড়ীতে যাবে না। তাহ'লে কেউ না কেউ আবার তাকে 'দেমাকী' আখ্যা দেবো। কোন ছোঁড়ার সাথে জমিয়ে ব'সে আছে ছাখো গা। এখানে আইসবে ক্যানে? একথাও কেউ ব'লতে পারে।

কেউ ওর বাপ-মাকে দোষাবে। সব কিছুকে ভাগ্য মনে করে সে তাদের কষ্ট বাড়াতে চাইলো না।

বিয়ে বাড়ীতে দ্যাখা হ'লে পূর্ণিমার মা কথা না ব'লে তাড়াতাড়ি তাকে পেরিয়ে গ্যালো। আলোমতি ভাবে এটা ইচ্ছা ক'রে করা। যেতে যেতে একটি ঘরে ভিড় দেখে সে উঁকি মারে। পূর্ণিমার অ্যাক মাসী আর কয়েকজন বান্ধবী তাকে বিয়ের সাজে সাজাচ্ছে। কেউ তাকে বিশেষ গ্রাহ্য ক'রলো না। তারও পূর্ণিমার সামনে যাবার ইচ্ছা ছিলো না। ওখানে ওকে আরো হতশ্রী আর বেমানান দ্যাখাবে। দরজা ছেড়ে এগোতে যাচ্ছে, সেই সময়ে তার কানে এলো,—ঢেঙানি! অপয়া!' সে গা করে না, গালাগালি শুনতে শুনতে সে অ্যাখন অভ্যস্ত। যেতে যেতে সে রান্নাশালে মুখ বাড়ায় ক্যামন আয়োজন হ'য়েছে দ্যাখার জন্য। তার মা কোনোদিকে না তাকিয়ে অ্যাকটানা মসলা বাট ছিলো। হঠাৎ সে দ্যাখে, স্বামী পরিত্যক্তা বাউরিদের মেয়ে শুভঙ্করী উঠোনের দূর অ্যাক কোণে আমগাছের তলায় তার মেয়েকে নিয়ে ব'সে আছে। আলোমতি তার কাছে ব'সে গল্প শুরু ক'রলো।

এর প্রায় অ্যাক মাস আগে থেকে শোনা যাচ্ছিলো রাত্রে শুভঙ্করীর উঠোনে নেপাল বাউরিকে দ্যাখা গিয়েছে। নিচু হাতের ব্যাপার নিয়ে গাঁয়ের লোক বড়ো মাথা ঘামাতো না। কিন্তু শুভঙ্করীর কেউ নেই। সেই জন্য তার পিছনে লাগার মতো লোকের অভাব হ'লো না। সে অরবিন্দ স্মৃতি জুনিয়র হাইস্কুলের ঘরদোর পরিষ্কার ক'রতো। গাঁয়ের লোকের চোখে সে সরকারি লোক। মুরুব্বিদের কারো কারো মত,— 'বিচার ডেকে উর কাজ ছাড়িয়ে দাও। সরকারি ইস্কুল বটে, মানতে হবে।' এর বিপরীত মতও শোনা গ্যালো। ছেলে-ছোকরাদের মতামত। প্রদীপ রায় তাদের নেতা।

সে আগের বছর শ্রীনিকেতন থেকে পাশ করেছিলো। ঘটনাক্রমে সে কবি প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসে। তিনি তাকে তাঁর মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর কথা বলেছিলেন। আর্টিস্ট নন্দলাল

একটি ছেলেকে মৌমাছির আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন কিন্তু নিজে আক্রান্ত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রভাতমোহন তাঁর নিকট আত্মীয় জমিদারদের বাড়ী লুঠ করে লুঠের মাল প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রদীপ রায় এইসব শুনে অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলো। প্রাক্তন সহপাঠী, বন্ধু আর কমবয়সী সঙ্গিদের সে বললো,—'ওকে তাড়ানো চ'লবে না। ও কাজে ফাঁকি ছায় নি। নেপাল বাউরির সাথে ওর কি আছে না আছে কেউ নিজের চোখে ছাখে নি।' ও তরুণকে ব'ললো,—'আমার নাম করিস না কো। বুড়ো ভামগুলো শুনলে ব'লবে প্রদীপ রায় মদনপুরের ছেলে। চন্দনপুরে ও কথা বলার কে? আবুল করিমের কাছে, কমরেডদের কাছে যা। ওরা এদের বিরুদ্ধে।' আশ্চর্য! প্রদীপের বাবা দেবেন রায় এই জন্য এখানে ইস্কুল তৈরি করার জায়গা দান করেছিলেন?

তু'অ্যাকজন প্রকৃত উৎসাহী। মুরুব্বিরা ছেলের দলকে বরাবর তাচ্ছিল্য ক'রে এসেছে, ওরা তাই এদের বিরুদ্ধে। অনেকে এতে হই-চই, তামাসার খোরাক পেলো। ছেলেদের দলের নির্মল ঘোষ দেখলো পরেশ ময়রার উপর শোধ তোলার এই সুযোগ। তাদের মধ্যে পারিবারিক শত্রুতা। সে ব'লতে শুরু ক'রলো,—'শুভঙ্করীর বিচার ক'রবে তো আগে পরেশ ময়রাকে সামালো। বেটা নষ্ট চরিত্তর। উ কতো মেয়েকে নষ্ট ক'রেছে তার ঠিক নাই কো।' মণিরুল বলে,—'শালোর বুড়োরা পরেশ ময়রাকে কিছু ব'লবে না কো। উরা আলোমতিকে ব'লবে, শুভঙ্করীকে বলবে; উরা মিস্ত্রিরি বাউরি তার লেগ্যে। 'আব্দুল করিম ব'ললো,—'আমরা জোতদার, জমিদারদের তাড়িয়েছি, সরকার গড়েছি। ওরা অ্যাখনও পিছন থেকে দাঁত বসাচ্ছে। ···এসব ছেলে-খ্যালা নয়। বুঝে কাজ করো।'

তোজাম্মিল হক ইস্কুলের সেক্রেটারি। সে মুরুব্বিদের অনুরোধ রাখার চেষ্টা ক'রছিলো। শীঘ্রই সে বুঝলো বিনা প্রমাণে শুভঙ্করীকে

ছাড়ালে আব্দুল করিম এবং তার অনুগামী নেতারা এটাকে তার বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে। কে কে তার পক্ষে থাকবে নিশ্চয়তা নেই। যারা মুরুব্বি বা ছেলেদের কারো পক্ষে নেই তারাও দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। সেজন্য সে এই নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রলো না।

গল্প ক'রতে ক'রতে শুভঙ্করী আলোমতিকে ব'লছিলো,—'রাখ তুর খচ্চড় বুড়োগুলাকে। উরা মেয়ে ছেলে নিয়ে খেলাবে দোষ নেমে ভুখে আমাকে। উরা শক্ত লোককে কিছু বলবে না কো। নরম পাবে তো ত'াকে নখ দেখাবে। তু চুপচাপ রইছিস ক্যানে? ইখানে কার পোঁদে গু নাই কো?' আলোমতি চুপ ক'রে ব'সে ভাবছিলো যে ভাগ্য তাকে কারো ঘর ক'রতে দেবো না। শুভঙ্করীরও স্বামী থাকা না থাকা সমান।

অ্যাকবার সে শুভঙ্করীকে জিগ্গেস ক'রেছিলো;—'তু যাত্রা গান শুনতে ভালোবাসিস?' শুভঙ্করী ব'লেছিলো,—'যাত্রা শুনতে কে না ভালোবাসে? 'তু উসব ব'লছিল ক্যানে? যাত্রা গান হ'তে তুর সর্ব্বোনাশ হ'লো। 'এরপর আলোমতি তাকে যাত্রা বা অভিনয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলে নি। শুভঙ্করীকে নিয়ে খুব বিতর্ক শুরু হ'লে ও শুধু তাকে ব'লে ছিলো,—'তু যাত্রা করিস নাই কো। তুর মুখ রইছে। তুর ক্যানে অমন হলো?' যাইহোক, আলোমতি বুঝেছিলো অ্যাকমাত্র শুভঙ্করীই তাকে যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার ক'রছে।

ছেলের দলকে আলোমতি বিশেষ পছন্দ ক'রতো না। নির্মল ঘোষ পূর্ণিমার বাবাকে ইঙ্গিত ক'রে কাউকে ব'লছিলো,—'আমরা জামা পরি, প্যান্ট পরি কি সিনেমায় যাই তো উর কি? উর পয়সায় করছি?' আলোমতি ভাবলো,—'আচ্ছা হইছে।' প্রায় অ্যাকই কথা সে চন্দ্রশেখর রায়ের মতো ভালো লোককে ইঙ্গিত করে তার ছেলেকে ব'লেছিলো, আলোমতির শুনে খারাপ লেগেছিলো। এরা কখন কি করে তার ঠিক নেই।

আলোমতি সামিয়ানার দিকে তাকালো। ভিড় কমেছে। জাত-পাতের ভেদ আগের মতো অতোটা ছিলো না। তাহলেও বামুন-

কায়েতরা আগে খেয়ে চ'লে গিয়েছে। একটু নিচু জাতের বিশেষত অভাবীরা ওদের মধ্যে ব'সতে ইতস্তত ক'রছিলো। জাত-ভেদের প্রকোপ কমেছে আর অ্যাক দিকে আর্থিক কৌলীন্য ধ'রে বিচার করা বাড়ছে। সতরঞ্চি আর খড়ের আঁটি বিছিয়ে ওরা লোকজন খাওয়ানোর জায়গা হ্যাজাকের আলোয় আরো শূন্য মনে হচ্ছে। শুভঙ্করী সায় দিতে—আলোমতি উঠে গিয়ে অ্যাক কোণায় ব'সলো। কোনো দিকে না তাকিয়ে কারো সঙ্গে কথা না ব'লে সে খাওয়া শেষ ক'রলো, হাত-মুখ ধুয়ে চ'লে গ্যালো।

## অনুসন্ধান কাণ্ড

কাত্তিক মিস্ত্রির বক্তব্য :—আমি আলোমতির কুটুম বটে। কাকা দূর সম্পর্ক। আমি উর থেকে তিন বচ্ছরের বড়ো। তুমরা আমার বন্ধু বটো। তুমাদের ব'লতে লজ্জা নাই কি আমি কেলাস ফাইভে ফেল করলাম। আলোমতির সাথে প'ড়তে লাগলাম। উ কেলাস সিক্সে পড়া ছাড়লে। উ আমাকে সব ব'লতো। উর ভালোবাসার কথাটি আমাকে বলে নাই কো। আমি উকে বাঁচাইতাম।'

শুভঙ্করীর বক্তব্য :—শা-লে কাত্তিকে! উ যিখান যাবে, নাম্বা নাম্বা কতা গাইবে। উ-ই আসল বটে। উই রাতে কাত্তিকে আমার ঘরকে যেতে নিইছিলো। তুররা ধরতে লাগলে। নিজের নামটো চাপবার লেগ্যে উ আমার নামটো নেপাল বাউরির নামটো রটায়েঁ দিলে। আলোমতির বদনাম উ-ই দিলে। রাজু দুকানদার উকে এম্নি মুখে ব'লেছিলো। আমার সন্দ, কাত্তিকে যদি নাম ক'রলে তো উ আলোমতিকে নষ্ট করার তালে ছিলো। তুমরা কি কিছু কম বটো? তুমরা যা ক'রলে। অচিন্ত্য তুমাদের লেগ্যে ঘর ছাড়লে। আমাদের জেতের ভিতর উদের যা পয়সা ছিলো। উ নিজের খুশি মতো পরতো। তো ইর ছাড়বে ক্যানে? উ মেয়েদের জ্বালাইতো বটে, তো ইদের মতো চরিত্তরহীন লয়কো।

আমার দু' বুনঝি বোলপুর থিক্যে এলো। বুন আসে নাই কো। উরা একাই আসলে টাউনের মেয়ে, সাহস কতো বলো। উরা আমার মণির জুড়ি হবে।' এ-ই দশ কি এগারো। আমার দু' বুনঝির নাম সন্তোষী আর ঝাপসী। দু-ই শিউলি পুকুরের ধারকে আমার ঘর। অত্তো বড়ো পুকুর ইধারে নাইকো। জল কতো পরিষ্কার। উর পারে কঁত্তো নিমগাছ। ইর মাঝে আমার ঘর।

সি দোলপুন্নিমের রাত বটে। মণি সন্তোষী দু'জনা দু'জনাকে জ্বলাইতে লেগ্ গ্যালো। উরা ছুটো তো কি উরা সব শিখে গেইছে। আমার মা হেসে হেসে উদের কি ব'ললো। তো সন্তোষী মণিকে বললে,—'তুর—বর আছে। তু ভালোবাসা করছিস বল।' শেষ কালে মা ঠাট্টা ক'রে উদের বললে,—'তুদের অ্যাকটো জামায়ের সাথকে বে দে দুবো।' মণি-সন্তোষী ব'লতে লেগ্যে গ্যালো কি,—'আমার ইস্কুলে পড়ছি বে করার লেগ্যে লয়, চাকরি করার লেগ্যে।' ও মা ওই ট্রুকুন মেয়েগুলা অবাক ক'রে দিলে। ই সব বাবুদের ঘরে হয় তাই ব'লে আমাদের ঘরে! বোলপুরের মহিলা সমিতির খুকুদিদি উদের ইসব শিখ্যেছিলো।

সি রেতে আলোমতি এইছিলো। উর মনটো ছুটোপারা হয়্যে রইছে। মণি-সন্তোষীর কথা শুনে উ হাসলে, নিয়ে আগের পারা হয়্যেঁ গ্যালো। পরদিন উর মতো মেয়ের কী বদনাম গো।

আমি নিয্য কতা ব'লবো। আলোমতি গান এইছে। সবাই যেছে, উ যেতে গেছে না কো। উই রেতে উ ঘর গ্যালো তো উর মা গাল দিতে লাগলে,—'তু কুথাকে গেইছিলি। বেউশ্যে, নটি—তুখে গাঁয়ের নোকে অ্যাতো বলছে।' ইসব ঠিক কথা লয় কো। আলোমতি মাকে ব'ললে,—'তুরা গাঁয়ের নোকের কথা শুন গা। আমার কথা শুনতে হবে না কো।' ঘরে থাক কি চ'লে যাক—উর বদনাম আর কষ্ট। উ আলোমতি যাত্রা দলের সাথকে চলে গ্যালো।

## উত্তর আঠারো কাণ্ড

আলোমতির স্বামী কুমুদ কর্মকার। সে নানা সমস্যায় জর্জরিত। কে তার কথা ধৈর্য ধ'রে শুনবে। সে এই রকম বলেছিলো—'আমি দোটানায় পড়েছিলাম। অতো তাড়াতাড়ি ওকে কি রোল দেবো। ওর বাপ-মা আছে। চন্দনপুর গাঁয়ের লোকরা ক্ষেপে যাবে কি না জানি না। শেষ কালে ঠিক করলাম কি ওই গাঁয়ে ওর স্টেজে না ওঠা ভালো।'

যাত্রা শুরু হ'তে অ্যাক ঘণ্টা বাকি। আমি সবাইকে গ্রীণ রুমে ডাকছি। এই ঝঞ্ঝাটের মাঝে আমার দলের দু'জন ফিমেল ওকে আনলে। আলোমতি ব'ললে, আমি কেষ্টযাত্রা করেছি। আমি পারবো।

ও আসলো ভালো হলো। অ্যাকটা ফিমেল বারবার ব'লছিলো দল ছাড়বে। আলোমতি আমাকে বাঁচালে। আমিও ওকে বাঁচালাম। ওর জন্যে আমার দলের নাম। আমাকে দল চালাতে হয়। আমি জানি লেন-দেন কি জিনিস। যদি আমি তোমাকে দু' পয়সা দিই, তুমি আমাকে দু' পয়সা দেবে।

আমার সংসারে তখন খুব ঝঞ্ঝাট। বাবা মারা গ্যালো। বাবার কাজ সারতে না সারতে মা-তে বউ-তে ঝগড়া, অশান্তি। বউ ব'ললে ও বাপের বাড়ী চ'লে যাবে। ওর খুব মুখ ছিলো। মা ওকে ছাড়তে ব'ললে নিয়ে আবার বিয়ে ক'রতে বললে।

আমাদের সাঁইথিয়ার দিকে ত্যামন দল ছিলো না। কেউ তার মেয়েকে ছাড়বে না। এ মেদনীপুর নয় কি যে অ্যাক গাঁ থেকে দশ-বারোটা দলের লোক বেরুবে। আমি বুঝেছিলাম আলোমতি কোন তালে প'ড়েছে। এই গাঁ গুলোকে আমি ভালো জানি।

আমার প্রথম পক্ষের, বউ সত্যিই চ'লে গ্যালো। ঘর-দোর কে সামলাবে। আমি ওকে আনতে যাই নি। ভেবেছিলাম কি দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে ও ঝামেলা ক'রবে। ওকে তিন বিঘে জমি কাগজ-কলম ক'রে দিয়েছিলাম। ও আসে নি, খবর করে নি। ওর ছেলে-

মেয়ে হয় নি, টান ছিলো না সংসারে।

আমি আলোমতিকে বিয়ে ক'রলাম। আবার যদি কেউ ওর বদনাম ছ্যায়। মা প্রথমে রাজি ছিলো না। ওরা ছুতোর আমরা কামার। মাকে বোঝালাম কি আমরা আর কামারের কাজ করি না। আমাদের অতো জাতবিচার থাকা ঠিক নয়। ব'ললাম, আমি যদি ওকে বিয়ে না করি, ও কি ক'রবে। মা ব'ললো, ভগবান ওকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। ও ইংরেজি আটাত্তর সালে বন্যার বছরে এসেছিলো। সে বছর আমি কেয়ার না ক'রে দল নিয়ে বেরিয়েছিলাম।'

এর দু' বছর পর আলোমতিদের দল আবার গুণসীমেতে এসেছিলো। দ্বিতীয় দিনে কুমুদ কর্মকার পঞ্চরস নামিয়ে ছিলো। দু' দিনের অনুষ্ঠান। প্রথমে পঞ্চরস, মাঝে আসল বই 'কালো বরণ ডাকাত', শেষে আবার পঞ্চরস। দর্শক ধ'রে রাখার জন্য এই ব্যবস্থা। আলোমতির গান দিয়ে সেদিন আসর শেষ। ও ফিল্মি গানের প্যারোডি গাইছিলো।

পুরুষ—বলি ও লো যুবতী
তুমি কিনবে তালের আঁটি
কচি তালের মিষ্টি আঁটি নাও না।
মেয়ে—আমার বাবা নাই কো ঘরে
আমি কিনবো ক্যামন ক'রে
আজকের দিনটা ও পাড়াতে যাবো না।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলোমতি প্রায় ছুটে এসে গ্রীণরুমে ধপাস ক'রে ব'সে পড়লো। কুমুদ ব'লছিলো,—'দাদা, ওর কষ্ট আমি বুঝি। ওর পছন্দ মতো ক'রলে পেটের ভাত জুটবে না। যাত্রা পালায় আদি রস না থাকলে কেউ আসবে না। আমাদের পাঁচ মাসের খোরাক এই ক'রে যোগাড় ক'রতে হয়। তো ওর সাথে ঘর ক'রে শান্তি আছে। ওর মুখ অমন নয়। দাদা, এই রকম চালাতে পারবো তো? তবু ভালো। যদিও অন্য কারো হাতে পড়তো?'

# নবীন-কৃষ্ণের দিনকাল

## ১

আমরা অনির্বাণ মিত্রকে গত বছরে তার জয়দেব মেলা ঘোরার কথা জিগ্গ্যেস ক'রছিলাম। নবীন কে ছিলো আর ক্যানো বাউল হ'লো দিয়ে সে শুরু ক'রেছিলো। হাঁটতে হাঁটতে আমরা অজয়ের পাড়ে উঠেছি। ভাঙা মেলার আলো আর গুঞ্জরণ যেনো অজয় নদীর হিমশীতল অন্ধকার চরে ডুবে যাচ্ছিলো। প্রশস্ত চরে কয়েক মিটার চওড়া চকচকে ধারাটা জলস্রোত। হাজারো মানুষের মল-মূত্রের দুর্গন্ধ। বহুদূরের দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের আলোর প্রেক্ষাপটে নদীর অপর পাড়ের বন আবছা আড়ালের মতো।

সে বছর মেলা জমজমাট। সেটা ছিলো পৌষ সংক্রান্তি অর্থাৎ পৌষ মাসের শেষদিন। বৃষ্টি ছিলো না। আট-দশ জন গৃহবধূ আর গাঁয়ের মেয়েদের নিয়ে মিনতি ত্রিপল ঢাকা মাটিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রায় সামনের সারিতে ব'সেছিলো। মিনতি নিজেও গৃহবধূ। জয়দেব থেকে কিছুটা দূরে আকোনায় মিনতির বাড়ি।

অনুষ্ঠানের দিকে মিনতির বিশেষ নজর ছিলো না। ও নবীন বাউলের অপেক্ষায়। সে শিবশম্ভুর পরে স্টেজে উঠলো। তার পরণে আলখাল্লা মাথায় পাগড়ি, কোমর কাপড় খণ্ড দিয়ে বাঁধা, সব গেরুয়া রঙের। যন্ত্রণায় মিনতি মাথা নামালো। কেউ কিছু বোঝার আগেই ও শীত লাগার ভাণ ক'রে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকলো। ছবি তার পরিবর্তনের কারণ অনুমানের চেষ্টা ক'রে ব'ললো,—'তোর শরীল খারাপ লাগছে?'

## ২

অনির্বাণ মিত্রের কাছে নবীনের অতীত সম্পর্কে যা শুনেছি সংক্ষেপে বলি। ঝুরকুনি গাঁয়ের নবীন আর কৃষ্ণ সহপাঠী মাত্র ছিলো

না। তারা অ্যাকে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারতো না। তাদের মাটির বাড়ি মুখোমুখি দাঁড়ানো। উঠোন বেড়া দিয়ে আলাদা করা ছিলো। বছর বছর পার হ'তে অ্যাকসময় বেড়া নষ্ট হ'য়ে গ্যালো, উনোনে জ্বালানোর কাজে লাগলো। একটি লোহার খুঁটির অবশেষ মাত্র দাঁড়িয়ে ছিলো, পুরোনের বেড়ার সাক্ষী।

ইস্কুলের পড়াশুনোয় নবীনের মন ছিলো না, কিন্তু সে ছিলো সর্বগ্রাসী পাঠক। গরীব বৈরাগী-পরিবারে নবীনের মতো বুদ্ধিমান ছেলেকে দেখে সবাই অবাক হ'তো। অনির্বাণ মিত্র ভালো ছাত্র ছিলো। পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে সে বর্ধমানের একটি কলেজ থেকে পাশ করে। তার গাঁ ঝুরকুনিতে সে গ্রীষ্ম আর পুজোর ছুটির সময় আসতো। নবীনের আগ্রহ দেখে সে তাকে নিয়মিত উৎসাহ দিতো ও ক্যালকুলাসের নিয়ম, থার্মোডাইনামিকস্-এর সূত্র, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, জে. ভি. নারলিকারের গবেষণা সম্পর্কে তার সঙ্গে আলোচনা করতো।

সে তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। অ্যাকদিন বিজ্ঞানের মাস্টার-মশাইকে সে ক্লাসে জে. ভি. নারলিকার সম্পর্কে কিছু ব'লতে ব'ললো। সাধারণ বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই বেশ বিরক্ত হ'য়ে ধমকালেন, —'কোথা থেকে রঘুনাথ পণ্ডিত এলো রে! যা নিজের কাজ কর গা।' তিনি নিজের কয়েকজন প্রিয় ছাত্রের দিকে একটু গর্ব ও বিদ্রূপ-মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,—'ইংরিজি, বাংলা না পড়িস, ক্ষেতি নাই কো। এই হ'লো বাবা বিজ্ঞান। হে! হে! অতো সহজ লয়।' নবীন তাঁর দিকে অ্যাকবার হতবুদ্ধি হ'য়ে তাকালো। পরে বুঝলো মাস্টারমশাই ওই বৈজ্ঞানিক সম্পর্কে বিশেষ জানেন না।

নবীনের ইস্কুল-জীবনের রোজকার ব্যাপারের এটা অ্যাকটা উদাহরণ। বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে সে ক্লাস থেকে পালাতো, বিড়ি খাওয়া ধ'রলো। কৃষ্ণ তার সঙ্গি হ'তো। ক্রমে তারা গাঁজা ধ'রলো।

বয়স্কদের চোখ অ্যাড়ানো কঠিন। তাই তারা ঝুরকুনি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে জয়দেব-এ যেতে শুরু ক'রলো। অ্যাকদিন প্রেমদাস বাউল তাঁর কুটিরের পিছনের ঝোপে ওদের দেখতে পেয়ে ডেকে বললেন,—'তোমরা এখানে কি ক'রছো? বাবা, এখানে এসো।' ওরা দাওয়ায় ব'সলো। প্রেমদাস তাদের বোঝাবার চেষ্টায় বললেন,— গাঁজার আসল সোয়াদ কোথা পাবে? সত্যিকার ক্ষ্যাপা হ'তে পারো তো বুঝবে নেশা কাকে বলে।' প্রেমদাস কয়েকটি গান ওদের শোনালেন। য্যামন,—'ইন্দুর মারা কল র'য়েছে জগৎ মাঝারে।' নবীন এই গান অনেকবার শুনেছে কিন্তু ওই মুহূর্তগুলো তাকে মনে করালো যে কেউ যেনো তার মনের ভাবকে ভাষা দিয়েছে।

কৃষ্ণ দুবরাজপুরের কাছে অ্যাকটা ছেলের দলে ভিড়েছিলো। ওরা ব'লতো,—'বি এ. এম. এ. ফেলে দে গা। চাকরি পাবি? প'ড়ে নিয়ে পয়সা নষ্ট করবি, অন্য ধারে লাগা। খানাপিনা কর, ধোঁয়া টেনে উড়িয়ে দে।' ওরা নকশাল হয়েছিলো কিন্তু পরে বিপথগামী হ'য়ে উন্মত্ত খুনীতে পরিণত হ'লো। 'অ্যাকশন' বলে চীৎকার ক'রে তারা লুঠতরাজ শুরু ক'রলো। অ্যাক সন্ধ্যায় কৃষ্ণ দুবরাজপুর থেকে হেতমপুর হ'য়ে ইলামবাজার যাবার পাকা রাস্তায় ওদের সামনাসামনি প'ড়ে গ্যালো। ওরা হিংস্রভাবে ছোরা, টাঙি দিয়ে অ্যাকটা লোককে কুপিয়ে নাড়িভুড়ি বার ক'রে দিলো।

প্রথম প্রথম দলে ঢুকে কৃষ্ণ সকালে বেরিয়ে কোনোদিন দুপুরে কোনোদিন সন্ধ্যায় ফিরতো। তার মা অ্যাকদিন নবীন আর অনির্বাণের কাছে খুব কান্নাকাটি ক'রলো। ওরা কৃষ্ণকে বোঝাবার চেষ্টা করে। সে হিংস্রভাবে নবীনকে বলেছিলো,—'তুই আমার গুরু। তু ইস্কুল ছাড়লি আমিও ছাড়লাম। তু আমাকে বলেছিলি ইস্কুল ফালতু জিনিস। আমি ইস্কুল পোড়াবার দলে গ্যালাম।' নবীন বলে,— 'আমি কখনো তোকে হিংসামি করতে খারাপ কাজ ক'রতে বলি নাই।'

এর কয়েক মাস পরে কৃষ্ণ ওই হত্যাকাণ্ড ছাখে। হত্যাকাণ্ডের স্থান থেকে দ্রুত সরার পর ও বাড়ি ফিরলো। বাড়ি ফিরে ওর খুব মাথা ধরে। ওই দলের নেতা অ্যাক সন্ধ্যায় তাকে পাশে ডেকে নিয়ে শীতল ধারালো গলায় বললো,—'যদি পুলিশ ওদের খোঁজ পায় তো তোকে আমি খতম ক'রে দেবো।" ভয় ও উদ্বেগে কৃষ্ণের দিন কাটে।

নবীন ইস্কুল ছাড়লো কিন্তু বিকল্প খুঁজে পায় নি। ঘরের কাজে তার বিশেষ মন ছিলো না। মা আর বড়ো ভাই এইজন্য তাকে গালাগাল দিতো। নবীন আরো উদাসীন হ'য়ে প'ড়লো। মিনতির সঙ্গে তার বিচ্ছেদও খুব বেদনাদায়ক। মিনতিকে আকোনায় অ্যাক মাঝবয়সী ধনীর সঙ্গে জোর ক'রে বিয়ে দেওয়া হ'য়েছিলো।

শীতকালে ১৯১৪-এর ডিসেম্বর যখন ফসল তোলা শেষ, তখন নবীনের সঙ্গে তার দাদা গদাধরের ঝগড়া হয়। গদাধর তাকে মারে। নবীন গদাধরের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করলো। দিনে সে কাছাকাছি গাঁ-গুলোতে ঘুরতো। বিভিন্ন দোকানে কাজ ক'রে দিয়ে ও সেখানে দুপুরের খাবার খেতো। সহানুভূতিশীল কাউকে পেলে সে তার যন্ত্রণা আর বিচ্ছিন্ন একাকীত্বের কথা ব'লতো। মিনতি সম্পর্কে সে একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি। নবীন রাতে সকলের খাওয়া শেষ হবার পর বাড়ি ফিরতে। তার মা অ্যাকটা আধ-ভাঙা অ্যালুমিনিয়ামের থালায় ভাত-ডাল-তরকারি হেঁসেলের অ্যাক কোণায় রেখে দিতো। শেষে ও বাউল হ'য়ে জয়দেব-এ স্থায়ী ভাবে বসবাস ক'রতে শুরু করে। তখন থেকে প্রেমদাস ওর গুরু।

৩

অতীন মিত্রের সুন্দর স্বভাবে নবীন মুগ্ধ হ'য়েছিলো। সে দুবরাজপুরের প্রশান্ত কুমার দাসের পারিবারিক বন্ধু। অতীন মিত্র বর্ধমানের কাছে অ্যাকটা কলেজে বাংলার লেকচারার হ'য়ে যোগ দিয়েছিলো। তার বয়স পঁয়ত্রিশের মতো। সাধারণত সে পায়জামা বা ট্রাউজারের

সঙ্গে পাঞ্জাবি পরতো, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। জয়দেব এবং বাউল সম্পর্কে তার খুব আগ্রহ। সে তাদের উপর স্বাধীন গবেষণা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো।

নবীন আর কৃষ্ণ তাকে নিয়ে অনেক আলোচনা ক'রেছে। তাদের কাছে সে শহুরে তর্কবাগীশ হ'লেও সরল হৃদয়। জয়দেব-এ এলে সে তাদের গল্প-গুজব, ঠাট্টা-তামাসায় যোগ দিয়েছে। নবীনের কথায় সে অ্যাকবর গাঁজাও টানে। নবীন তাকে রসিকতা ক'রে ব'লেছে, '—অতীন দা, আপনি যদি এই লাইনে থাকেন তো আপনার অ্যাকজন ক্ষেপি দরকার।'

এই কয়েক বছরে কৃষ্ণ পদ্মপুর গ্রামীণ লাইব্রেরীতে সাইকেল-পিওনের কাজ জুটিয়েছে। নবীন, কৃষ্ণ আর জয়দেব-এ চায়ের দোকানে ব'সে গল্প ক'রছিলো। ঝুরকুনির লোকরা প্রায়ই জয়দেব-এ আসতো। ওটাই তাদের সবচেয়ে কাছের বাজার। দোকানে কাজের ছেলেটা ছাড়া আর কেউ ছিলো না। কৃষ্ণ তাকে দু'কাপ চা দিতে বলে। তার চোখ জনবহুল রাস্তার উপর বারবার প'ড়ছিলো। সে বলছিলো লাইব্রেরীর জেনারেল মিটিং-এ তাকে পরিচালক সমিতির অ্যাক সদস্যের অত্যাচার সইতে হ'য়েছে। সেই সদস্য স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক। লাইব্রেরির সম্পাদক লাইব্রেরীয়ানকে সদস্য চাঁদা মেটাবার জন্য চিঠি লিখতে ব'লেছিলো। যে সব সদস্যের অ্যাক বছরের বেশি চাঁদা বাকি আছে তাদের জন্য এই চিঠি। ওই শিক্ষকের আড়াই বছরের চাঁদা বাকি। ইস্কুলের অ্যাক ছাত্র ওই শিক্ষকের নেওয়া বই পাল্টাতে এসেছিলো। কৃষ্ণ অ্যাকটা কাগজের টুকরোয় বাকি চাঁদার পরিমাণ লিখে শিক্ষককে পাঠায়। বই-এর ভিতরে কৃষ্ণ কাগজটা অ্যামন জায়গায় রেখেছিলো যাতে শিক্ষক ওটা সহজে পান। বার্ষিক সাধারণ সভায় ছাত্রের হাতে চিরকুট পাঠিয়ে সাইকেল-পিওন তাঁকে অপমান ক'রেছে এই ব'লে তিনি পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। মিটিং-এ কৃষ্ণ বলে চিরকুট সে বইয়ের ভিতরে রেখেছিলো যাতে ছাত্রের নজরে না আসে। শিক্ষক

অ্যাকজন প্রভাবশালী নেতা। তাঁর দলবল কৃষ্ণকে দোষারোপ করতে শুরু ক'রলো। সৎ ও সরল প্রকৃতির অপর অ্যাক শিক্ষক এই দেখে বিরক্তি প্রকাশ ক'রেছিলেন, এইমাত্র।

সে থামে। নবীনের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণ ভাবে ওর অ্যাক ক্ষেপি আর মেয়ে আছে। তবু ও অ্যামন ভাবে জীবন কাটায় যেনো ওর পিছু টান নেই। নবীন বলে,—'কি দেখছিস ? তু সংসারী না হ'তিস তো বলতাম্ ঘর ছেড়ে যেথায় খুশি চ'লে যা।' অতীন সেখানে একটু আগেই এসেছে। সে হেসে বলে,—'ও, তুমি আমাকে বিয়ে করতে বলছো আর ওকে এই পরামর্শ দিচ্ছো ?'

নবীন.—'আমি জানি আপনি ভালো লোক। তা'হলেও আপনি কাউকে বিশ্বাস ক'রতে পারেন না।

অতীন—হ'বে। অ্যাক সময়ে দেখি আমার মধ্যে বিশ্বাস আছে। আর অ্যাক সময়ে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি।

নবীন—বিশ্বাস না থাকলে আপনি বাউলদের বুঝবেন কি ক'রে ? আমাদের বিশ্বাস আছে। আমরা গুরুতে বিশ্বাসী।

কৃষ্ণের এসব ভালো লাগে না। অতীনের সমর্থন পাবে মনে ক'রে সে বলে,—'অতীনদা, আমি ট্রান্সফারের দরখাস্ত ক'রেছি। আমি গাঁ ছাড়বো।'

অতীন—তুমি কি ভাবছো শহর কিছু কেড়ে না নিয়ে তোমাকে কিছু দেবে ?

নবীন—অ্যাকজনকে কোনো অ্যাকটা পথ তো বেছে নিতে হবে। ।

অতীন—তা ঠিক। আমার যেনো সব কিছুতেই আগ্রহ চ'লে যাচ্ছে ? (

নবীন—অতীনদা, অ্যাকটা কথা ব'লবো, রাগ করবে না।

অতীন—শোনার আশায় তাকায়।

নবীন—আপনি অনুভূতি, ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন।

অতীন—সত্যিই তাই। আমাদের কালে হয় লক্ষপতি না হয় ভিখিরি হ'তে হবে। মাঝামাঝি হলে উভয় পক্ষ তোমার উপর চাপ সৃষ্টি ক'রবে। অতিরিক্ত ভোগ্যপণ্যের নিচে তোমার অনুভূতি চাপা প'ড়বে নয়তো দারিদ্রতা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে। এদেশে ঐশ্বর্যের সঙ্গে সৌন্দর্যানুভূতিকে মেলাবার চেষ্টা কোথায়? বিশেষতঃ, সমষ্টিগত কাজে? এইজন্যই আমাদের ডেমেক্রাসি আধা সফল হয়ে রইলো।

নবীন ওকে বাজিয়ে দ্যাখার জন্য বলে,—'কিন্তু আমাদের মধ্যে আমরা মানে যারা গান গাই তাদের মধ্যে অ্যাকটা কথা চালু আছে। তুমি যদি ক্লাসিক্যাল আর্টিস্ট হ'তে চাও, তোমাকে আমীর নয়তো ফকির হ'তে হবে। আমীর হ'লে অনেক গুরুর কাছে পয়সা খরচ করে শিখতে পারবে, গান শেখার জন্য নানা জায়গায় ঘুরতে পারবে। ফকির হ'লে, পিছুটান থাকবে না। সে-ও গুরুদের কাছে যেতে পারে, সেখানে থাকতে পারে।

অতীন—আমি কি ক'রবো আমি জানি না।

নবীন—তোমাকে আমি আবার বলি। কোনো মেয়েকে ভালো-বাসো। সে তোমার পাথর কঠিন ভাব কাটিয়ে দেবে।

অতীন—আর সে নিজে পাথর হ'য়ে যাবে, ফ্রিজ, টিভি, গয়না দাবি করবে। সে আমার সাধ্যের বাইরে। আমাকে তখন দু'নম্বরী ক'রতে হবে।

৪

অতীন, নবীন, কৃষ্ণ ময়ূরাক্ষী ফাস্ট´ প্যাসেঞ্জারে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় দুবরাজপুরে ফিরছিলো। তিনজন দু'টো সিটে বসেছিলো। ওরা প্রশান্ত দাসকে খবর দিয়েছিলো রাত্রে তার বাড়িতে থাকবে। নবীন অনুষ্ঠান সেরে ফিরছিলো। কৃষ্ণ ওর মায়ের জন্য ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলো।

এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়। বাইরে শুকনো, ধূসর মাঠে নরম সন্ধ্যা নেমেছে। বহুদূরে ছাড়া ছাড়া সবুজ অংশ অস্পষ্ট। অন্ধকার সবকিছুর উপর সমান ভাবে ছায়া বিস্তার ক'রছিলো। কামরার ভেতরে কয়লার চোরা কারবারি মেয়েদের আর কামিনদের উঁচু গলার দর কষাকষি, গল্প-গুজব। কামিনদের আর কামরায় মেঝেয় ব'সে থাকা মেয়েদের বাচ্চাগুলোর কোনোটা কাঁদছিলো, কেউ খেলছিলো, মুখ দিয়ে নানা সুরের তীক্ষ্ম আওয়াজ ক'রছিলো। অনেক শিশু চা, রুটি, চানাচুর খেয়ে ছড়াচ্ছিলো, হিসি করে লাল ফেলে নিজেদের ভেজা-চ্ছিলো। ওরা কামরার মেঝেতে অ্যামন ছড়িয়ে ব'সেছিলো যে যাত্রী-দের চলতে ফিরতে অসুবিধা হচ্ছিলো।

নবীন অতীনকে বলে,—'আমাদের দিন আনতে হয় দিন খেতে হয়। আপনি মদন নাগের নাম শুনেছেন? সে চায়ের দোকানে কাজ ক'রতো। সে সুন্দর বাউল গান লিখেছে।' অতীন বলে,—'আমি নাম শুনেছি। আশ্চর্য! বাউল কালচার ক্যামন ক'রে বামুন-ডোম-বাউরি অ্যাকত্র ক'রে দিয়েছে। আমি বাউল মেলায় দেখেছি। গ্রামেও অ্যামন হ'য়েছে।' মিনতির কথা নবীনের মনে পড়ে। আগে মিনতির বড়ো ভাইকে ভিন্ন জাতের মধ্যে বিয়ের সমর্থক বলে মনে হ'তো। সে পরে বলেছিলো,—'নবীনে বৈরাগীর সাথে বে? উদের আছে কি?' সে মিনতিকে মারধোর পর্যন্ত করেছিলো। তাই নবীন বলে,—'তুমি তো জানো ক্যানো আমি বাউল হলাম। সে অতীনের দিকে অ্যাকদৃষ্টে তাকায়, তারপর গান ধরে,—

কেউ আমাকে ভেতর থেকে
চিনতে পারলো না
আমি বাউল সেজে ছদ্মবেশে
খুঁজি মনের ঠিকানা।

এই বাউলের নেই তো গুণ
কেউ বা আমীর, কেউ বা ফকির
আমি বাউল হয়ে বাউল সেজে
পাই না তার ঠিকানা।

যাত্রীরা নবীনকে দেখছিলো। সে আবার গল্প শুরু করে, অতীনকে বলে,—'সোজা জয়দেব-এ আসুন। দুবরাজপুর হয়ে ক্যানো? আসুন আমাদের সঙ্গে থাকুন।' অতীন শুধোয়,—'মানুষ ধন-দৌলত ছ্যাখাত চায়। তুমি কি ছ্যাখাতে চাইছো? দারিদ্র্য?' নবীন অ্যাতো ভাবে নি। তারপক্ষে জবাব দেওয়া কঠিন। অতীন আবার জিগ্‌গ্যেস করে 'দারিদ্র্য কি তোমার জীবনের সত্যি?' 'তুমি যা বলো।' আমি শুধু দু'চোখ মেলে দুনিয়াকে দেখি। সব গুরুর ইচ্ছে।'—নবীন বলে।

নবীন অতীনের কথা কৃষ্ণর কানে যেনো অনেক দূরের গুঞ্জরণের মতো ভেসে আসছিলো। মাকে ছয় কিলোমিটারের বেশি রাস্তা গরুর গাড়িতে নিয়ে গিয়ে বর্ধমান যাবার বাসে তুলতে কী কষ্ট। যদি বর্ষাকাল হতো। তিন মাসের মধ্যে বর্ষা আসবে রাস্তায় কাদা হবে। পদ্মপুর পাবলিক লাইব্রেরী ঝুরকুনি থেকে পাঁচ কিলোমিটার। যাবার পথে অ্যাক জায়গায় প্রায় অ্যাক কোমর জল। কাদা রাস্তা আরো দুর্গম হবে। তার ছয় বছরের মেয়ে ময়নামতী প্রাইমারি ইস্কুলে পড়ে। ইস্কুলটা তার লাইব্রেরী যাবার পথে। তাকে আর তার মেয়েকে ৯টায় বেরোতে হয়। অনেকটা বর্ধমান-কোলকাতা ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের মতো। এরপর আছে চাষ। কে জানে, জ্যাঠা আর তার ছেলে এই চাষে তাকে কোন ঝামেলায় ফেলবে। সে কয়েক মিনিট ভাবে। কেউ তাকে বুদ্ধি দেবে না। নবীন অতীন? ওরা সোজা জিনিসকে গোলমেলে করে ফ্যালে।

সে বছর দুই আগে জেলাশহর সিউড়ির কাছে রবীন্দ্র পাঠাগারে বদলি হবার জন্য দরখাস্ত করে ছিলো। তর্ক-বিতর্ক, নানা ঝামেলায়

তা স্থগিত ছিলো। তার আগ্রহ কমে যায়। জামাইবাবুর বাড়ীতে কয়েকদিন কাটিয়ে আসার পর থেকে সে বুঝতে পারছে সেটা আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে।

৫

সেপ্টেম্বর মাসের তারা ভরা আকাশ। কৃষ্ণের জ্যাঠামশাই বনমালী দাস বিচারের ডাক দিয়েছে। তার অভিযোগ মধু তার অ্যাকটা ছাগল চুরি করে বেচেছে। দাম অন্তত চারশ' টাকা। সে বলছে যে সে অ্যাক প্রত্যক্ষদর্শীকে হাজির করতে পারবে।

বেশ গরম পড়েছে। তাই গাঁয়ের লোকজন রাতের খাওয়া সার-বার পর বিচার দেখতে বেরিয়ে ছিলো। তারা গাঁয়ের মাঝামাঝি জায়গায় বড়ো বট গাছের তলায় বিচার দেখতে যায়। কৃষ্ণ মজার খোরাক শ্যামা ডোমকে ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেলো। তার বয়স চল্লিশ না ষাট বলা মুসকিল। কেউ তাকে পিছন থেকে খোঁচা দিতে পারে বা টাক মাথায় চাপড়িয়ে দিতে পারে মনে ক'রে সে বেশি ভিড়ে যায় নি। কে তাকে ওই রকম ক'রছে বেশি ভিড়ে বুঝতে পারবে না। কৃষ্ণ দ্যাখে শ্যামা ডোম হাঁটু খাড়া করে উঁচু হ'য়ে বসেছে, পাছা মাটি ছোঁয় নি। সে বুদ্ধি আঁটলো। সঙ্গি ছেলেদের ডেকে সে শ্যামার নিচে খানিকটা কাদা রাখতে বলে। ছেলেদের মধ্যে অ্যাকজন চোরা চোখে চারিদিক দেখে নিয়ে পাশের পুকুর থেকে খানিকটা পাঁক আনে এবং শ্যামার নিচে রাখে। এই ধরণের দুষ্টুমিতে তারা সিদ্ধহস্ত। কিছুক্ষণ পরে শ্যামা মাটিতে বসে ঠাণ্ডা সিক্ত স্পর্শ অনুভব করে। সে ক্ষেপে ওঠে পাশেই হরিপদকে দেখতে পায়। সে তার ঘাড়ের কাছের গেঞ্জি চেপে ধরে। হরিপদ মাঝবয়সী, বেশ কয়েকবার শ্যামাকে জ্বালাতনও ক'রেছে। কিন্তু এবারে সে কিছু জানতো না। ওরা ঝগড়া শুরু করে। গাঁয়ের কিছু লোক মহা উৎসাহে ইন্ধন জোগায়। অতো হট্টগোলে বিচার-সভা মাঝ পথে বন্ধ করতে হয়। কৃষ্ণ ওখান

থেকে সরে। তার জন্য সভা পণ্ড হয়েছে। জ্যাঠামশাই তাকে দেখতে পেয়ে ব'লে বসলে গুরুতর ব্যাপার হবে। সে সাবধান হয়।

এর কয়েকদিন পর পদ্মপুর লাইব্রেরী সবে খুলেছে। কাছেই আগুন লেগেছিলো। কৃষ্ণ গরীব মানুষের কুঁড়ে বাঁচাবে বলে লাইব্রেরীর বালতি নিয়ে জল দেবার জন্য ছুটে যায়। দিন দশেক বৃষ্টি হয় নি। গণ্ডগোলে বালতি খোয়া গিয়েছিলো। লাইব্রেরীর কয়েকজন সদস্য সরকারি সম্পত্তির অপব্যবহার করেছে ব'লে কৃষ্ণকে দোষ ছায়। ওরা ওকে ঈর্ষা করতো কারণ ওর সুনির্দিষ্ট মাসিক আয় ছিলো। কৃষ্ণ বিরক্ত হ'য়ে বালতির দাম দেবে বললো কিন্তু ওর কথা কেউ শুনতে চাইলো না।

কৃষ্ণ অ্যাকদিন বাড়ি ফিরলে শ্যামা ডোম গালাগালি দিতে দিতে তাদের উঠোনে এলো। বিচার-সভায় সে-ই তাকে জ্বালিয়েছে ব'লে তার ধারণা। এরকম ক্ষেত্রে, কৃষ্ণ রাগের ভাণ করে। ও বলে, —'আমাকে কি বলছো? আমি কিছু জানি না কো। শ্যামা ডোম চ্যাঁচাতে থাকে,—'তোমার ছেলেমেয়ের মাথায় হাত দে' বলো। নইলে আমি মানবো না কো।'

কৃষ্ণ অ্যাক মুহূর্ত ভাবলো। ও শুধু পরামর্শ দিয়েছে নিজের হাতে কিছু করে নি। ও অনায়াসে দিব্যি গ্যালে। শ্যামা গালাগাল দিতে দিতে বেরিয়ে যায়, কোনো শালো আমাকে অমন করলে। তার ভিটে মাটি চাটি হোক গো।'

৬

অক্টোবর মাস। সকাল প্রায় ৯টা। নবীন তার কুঁড়ের বারান্দায় বসে ছিলো। কুঁড়ের চাল টালি দিয়ে ছাওয়া। উজ্জ্বল দিন। সূর্যের আলোর অ্যাকটা ছোটো টুকরো চালের ফুটো দিয়ে মেঝের উপর পড়েছে। তালপাতা আর তালাই দিয়ে তৈরি বেড়া। জয়দেব মেলার শেষে তালাইগুলো দোকানদাররা ফেলে দিয়েছিলো, নবীন

কাজে লাগিয়েছে। বেড়া জয়দেব বাজার আর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে কোনোক্রমে তার ঘর আড়াল করেছে। এর ঠিক পিছনে বড়ো বড়ো পাথর, ইট, সিমেন্ট আর মাটি দিয়ে উঁচু করা দীর্ঘ টানা অজয়ের পাড়। এর কোলে আধ-ভাঙা মন্দির হতশ্রী হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকে বলে মন্দিরটা কবি জয়দেবের আমলের।

নবীন জয়দেব-এ আসার তিন বছর পর প্রতিমা তার জীবনে এসেছে। সে নারায়ণ পুরে বাউল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলো। প্রতিমা তার বাবার সঙ্গে গান করতে এসেছিলো। নবীন অনুষ্ঠানের শেষে চলে যাবার জন্য তৈরি হ'চ্ছে, অ্যামন সময় প্রতিমার বাবা এসে তাকে বলে,—'বাপ, তোমার গান খুব ভালো লাগলো। এসো আমাদের ঘর হ'য়ে যাও। আমাদের বাস নারায়ণপুরে।' নবীন সেখানেই খাওয়া-দাওয়া সারলো। তাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ক্রমে প্রতিমা আর সে অ্যাক সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিতো। প্রতিমা নবীনকে বিয়ের কথা বললে সে প্রত্যাখ্যান করে। সে মিনতির কথা বলেছিলো। পরের বার সে নারায়ণপুর গেলে প্রতিমা অ্যাকটা কাগজে লিখলো'—'মিনতি তোমার হবে না কো। তুমি উখে ভালো-বেসেছিলে তো কি। তোমার কষ্টে আমারও কতো কষ্ট গো। প্রতিমা নবীনকে মুখে বলবে কিনা ঠিক করতে পারে নি। খুবই সম্ভব যে সে ওকে আবার প্রত্যাখ্যান করবে। সেই জন্য সে নবীনের হাতে কাগজটি দিয়ে মুখ লুকিয়ে ছুটে পালিয়ে গ্যালো। নবীন যে ঘরে বসে ছিলো তার পিছনে অ্যাক সময় সে প্রতিমাকে আবিষ্কার করলো। প্রতিমা কাঁদছিলো। নবীন তার নিষ্ঠায় মিনতির উপকার হবে না. এদিকে প্রতিমা কষ্ট পাবে। সে ওকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলো।

নবীন কল্কে রেডি করছিলো। গাঁজা থেকে বীজ আলাদা করে কাটনি দিয়ে দু'তিনবার কুচি কুচি ক'রে কেটে ও দু'তিনটে বিড়ির মশলা ওতে মেশায়। তারপর বাঁ হাতের তালুতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে বার বার মিশ্রণটাকে ডলতে থাকে।

অতীন পৌঁছয়। নবীন তাকে সাদর আমন্ত্রণ করে। প্রতিমা ব'সতে বলে। অ্যাকটা মোড়া এগিয়ে ছ্যায়। 'অতীনদা, মুড়ি খান'— নবীন বলে। বলাই এর দোকান থেকে ও চপ নিয়ে আসে। অতীন হাত-পা-মুখ ধোয়। প্রতিমা অ্যাকটা থালায় মুড়ি, অল্প সর্ষের তেল, চপ ছ্যায়। খানিকটা চিনিও থালার অ্যাক কোণায় ছ্যায়। অ্যাক ঘটি জল পাশে রাখে। অতীন নবীনকে বলে—'তুমি খাবে না?' নবীন কল্কে দেখিয়ে বলে,—'অ্যাখন টানবো।' মুড়ি খাবার পর অতীন বলে,—'চলো কদমখণ্ডী ঘাটে যাবো। তারপর প্রেমদাস বাবাজীর কাছে।' নবীন বলে,—'আজ বুধবার কৃষ্ণ আসবে। ওদের আজ ছুটি। আমি ওকে আসতে বলেছি। চলুন, বলাই এর চা-দোকানে বসি। ও ওই ধার হয়ে আসবে।'

কৃষ্ণও কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছয়। ওরা কদমখণ্ডী ঘাটে যায়। অতীন কৃষ্ণকে জিগ্যেস করে,—'তুমি সত্যিই গ্রাম ছাড়ছো?'

কৃষ্ণ—হ্যাঁ। অতীন—কিন্তু ক্যানো?

কৃষ্ণ—লোকের হিংসা। খুব ক্ষতি করছে। আমি ওখানে থাকতে পারবো না। আমার সাত বিঘে জমিতে কমরেডরা বর্গাদার বসিয়েছে। বাকি আট বিঘে আমার। মুনিষকে ডেলি আট টাকা আর চাল দিয়ে কিছুই থাকে না। আমার সংসারে মোট পাঁচজন লোক, দু'জন ছোটো। তাতে সারা বছর চলে না। গত বছর আমার অ্যাক বর্গাদার আমাকে অ্যাক বস্তা ধান দিলো ব'ললো কি—আমি চাকরি-অওলা লোক। আমার অতো দরকার নাইকো। দেখুন অ্যাকবার। মাইনে তো পাই মেরে কেটে হাজার টাকা।

অতীন—ওরা মানে বামফ্রন্ট তোমার জমি বর্গা ক'রেছে অ্যামন ওরা গ্রামে লাইব্রেরী ক'রে তোমাকে চাকরি দিয়েছে।

কৃষ্ণ—লাইব্রেরীতে লোকগুলো যে দলে থাক, ঝামেলা করে। ওরা ওরা লাগবে, যারা কাজ করে তাদের ঝামেলা সইতে হয়। আমি যে অ্যাকা। অ্যাতোগুলো লোকের সাথে অ্যাকা কি ক'রে লড়বো?

অতীন—তোমাদের অফিস, ইউনিয়নকে খবর দাও নি ?

কৃষ্ণ—হ্যাঁ, তারা আসতে চাইছে। অ্যাতো দূরে রাস্তা নাই, কিছু নাই—এখানে ওদের কিছু করা কঠিন। ওরা যা ক'রবে বাইরে থেকে ক'রবে আমাকে যে এদের মধ্যে থাকতে হবে।

হিংসে বুঝলেন মশাই হিংসে। রাজনীতি নয়। আমার নিজের জ্যাঠা সব সময়ে আমার বাগানের ক্ষতি করছে। ওর ব্যাটা চোর। ওরা বেশি কিছু করার আগে থেকে চ'লে যাই।

অতীন—তোমার জ্যাঠা বা কয়েকজন লোক তোমার শত্রু হ'তে পারে। অন্যরা নিশ্চয়ই ভালো ব্যবহার করে। গ্রামের লোকেরা এর জন্য দায়ী নয়। আমাদের সরকারি পরিকল্পনার ত্রুটি এর জন্য দায়ী। দুটো পরস্পর বিরোধী দল দুই সরকারে রয়েছে—কেন্দ্রীয় সরকারে আর রাজ্য সরকারে। উভয়ে অ্যাক ভুল ক'রে চলেছে। বাজার দর যতো চ'ড়ছে এরা ততো মাইনে বাড়াচ্ছে। বেকাররা কি ক'রবে ? ওদের জায়গায় তুমি নিজেকে বসিয়ে ছাখো।

কৃষ্ণ—অতীনদা, যদি গাঁয়ে আপনাকে থাকতে হতো আপনি অ্যাতো কথা ব'লতেন না।

অতীন—কিন্তু ওরা গাঁয়ের লোকদের অধিকার সচেতন ক'রেছে। কুড়ি বছর আগে তোমাদের জীবনযাত্রা কি রকম ছিলো ?

'পার্টি-টার্টি ক'রছেন নাকি ?' কৃষ্ণ ব'লতে যায় কিন্তু থামে। যদি এই লোকটা সত্যিই কোনো পার্টির লোক হয় তা'হলে বিপদ। অতীন কিছু অনুমান ক'রে বলে,—'আমি রাজনীতি করি না। আমি সব সময়ে প্রতিপক্ষের মৃত্যু দেখতে চাইতে পারবো না।

নবীন—অতীনদা তোকে সত্যি কি হচ্ছে তোকে বলছে। সত্যি জিনিসটা শুধু নিজের জন্য রাখা ঠিক না। অতীনদা, আমি মানুষকে বলতে চাই। পার্টিগুলো কি করবে ? মানুষ নিজেই যে খুন হ'চ্ছে।

কৃষ্ণ—আমি অ্যাকজন সাধারণ লোক। তোদের মতো পড়ি নাই !

আমি কষ্ট পাচ্ছি, এইটা বুঝতে পারি। সে আরো বলে,—অতীনদা, আপনি বিয়ে করেন নি। আপনার ছেলেপুলে নেই। আপনি বু'ঝতে পারবেন না গাঁয়ে ছেলেদের ঠিক রাখা কী কঠিন। আমি সিউড়িতে আমার ভাগনেদের দেখেছি। ওরা কতো চালু।'

অতীন থামে। ও কারো উপরে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চায় না। ওরা অন্য বিষয়ে যায়। অনির্বাণ মিত্রের কথা উঠলে কৃষ্ণ নবীনকে বলে,—'ওই, লোকটার জন্য তোর জীবন নষ্ট হলো। নিজে ব্যাঙ্কের অফিসার হ'লো এদিকে···

নবীন—ওর উপর রাগ করিস না। মাসে মাসে সেটা মা২নে পেলে কি হবে? ওর সংসারে শান্তি নাই। ওর বউ অ্যাকোনা হাসপাতালে নার্স। বউ ওকে ব'লেছে ও তাদের অ্যাকমাত্র ছেলেকে নিয়ে চ'লে যাবে। আর অন্য কোথায় থাকবে।

কৃষ্ণ—তুই যদি লোকটার পণ্ডিতি মার্কা লেকচার না শুনতিস! তোর ইস্কুল, তোর চারধারের সব কিছুকে মানিয়ে নিতিস, তুই অতীনদার মতো হ'তে পারতিস।

নবীন—আমি হই নাই তো কি হলো। যা আছে সব ঠিক আছে। সব গুরুর ইচ্ছে। কৃষ্ণ নবীনের দিকে তাকায়। ও বুঝতে চেষ্টা ক'রে সে কি ব'লতে চাইছে। আজ পর্যন্ত ও ওকে বুঝতে পারলো না। অগত্যা সে রসিকতা করে। বলে,—'তোর ইচ্ছে অতীনদার উপর খাট্টা। যেনো অতীনদা বিয়ে করে। আমরা ভালো করে অ্যাক পাত খাবো।

নবীন—থাম দিকিনি।

অতীন—গত রাতে তোমাকে বিয়ের ভোজ খাওয়ালাম। আজকেই তুমি ভুলে গেলে।

এই রকম মিথ্যা কথা রসিকতা হিসাবে চ'লে যাবে কৃষ্ণ বুঝতে পারেনি। ও কি অ্যাকটা ব'লতে যাচ্ছিলো। ইতিমধ্যে নবীন হাসতে হাসতে ব'ললো,—'গ্যালো রাতে ও বউকে ভালোবাসতে ব্যস্ত ছিলো।

তাই ও ভুলে গিয়েছে।'

সাড়ে অ্যাগারোটা বাজলো। নবীন ছায়া দেখে সচেতন হয়। তরকারি আনাজ কেনা হয় নি। সে তাড়াতাড়ি উঠে বলে,—'ভুলে গেছি। বাজার যেতে হবে। আপনারা বসুন, গল্প করুন।' নবীন হাটতে শুরু করে। ওরা ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। ওরা নবীনের পিছু পিছু যায়। উঠোনে আসতেই প্রতিমা তাকে বলে,—'কোথায় গেছিলে? বেশ হয়েছে। শুধু মাছ, ভাত খাও। 'গণেষের কাছ থেকে পাঁচশ মাছ জোগাড় করেছি।' অতীন, কৃষ্ণ ঢোকে। বাইরে থেকে ওরা শুনেছে। অতীন নবীনের পক্ষ নিয়ে বলে,—'ওতে কি হলো। ব্যস্ত হবেন না।' কৃষ্ণ উচ্ছ্বসিত হয়,—'মাছ-ভাত! আঃ! দারুণ!' নবীন বাইরে যায়। পাশের হোটেল থেকে ডাল তরকারি নিয়ে আসে।

প্রতিমা চুড়ির রিনরিনি তুলে জলছড়া ছায়। গোবর ল্যাপা, ছোটো অথচ মায়ের মতো লাবণ্যে ভরা মাটির মেঝেতে ঝাঁট ছায়। সে নিজের হাতে বোনা আসন, তিনটে থালা আর বাটি বের করে। নবীন এগুলো বিক্রি ক'রে দিতো। প্রতিমাই নিজের কাছে রেখেছে। ইতিমধ্যে নবীন, অতীন, কৃষ্ণ হাত-পা ধুয়ে এসেছে। প্রতিমা থালায় ভাত বাড়ে। নবীন সবাইকে আসনে বসতে বলে। প্রতিমা তাদের সামনে ভাতের থালা রাখে। ডাল-তরকারি থালাতে দেওয়া হয়, মাছ বাটিতে। অতীন প্রতিমাকে অনুরোধ করে,—'বৌদি আমাদের সঙ্গে ব'সে পড়ুন।' কৃষ্ণ মাথা নাড়ে। প্রতিমা মৃদু হাসে। অতীন নবীনকে বলে,—'হোটেল থেকে এগুলো ক্যানো আনলে? আমাকে ক্যানো নেমতন্ন ক'রেছিলে মনে করো। তোমরা কিভাবে দিন কাটাও তাই দেখতে চাইছিলাম।' প্রতিমা বলে,—'ও সবই ভুলে যায়। আপনারা ব'লে। অন্য লোক হ'লে কি হতো। উনি সারা দিন রাত গাঁজা টানবেন। গানের গলার বারোটা বাজছে।'

খেয়ে হাত ধুতে ধুতে অতীন বলে,—'আর কোথাও খেয়ে অ্যাতো

তৃপ্তি পাইনি। নবীন, হোটেলের ডাল-তরকারি কোনো দরকার ছিলো না।'

অতীন বুঝতে পারে ক্যানো নবীন তাকে বিয়ে ক'রতে ব'লেছে। কিন্তু অনির্বাণ মিত্রের উদাহরণ তার সামনে আছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর কৃষ্ণ রওনা ভ্যায়। অতীন সেই রাতটা নবীনের কুঁড়েতে কাটায়।

৭

আমি অনির্বাণ মিত্রকে জিগগ্যেস ক'রছিলাম কৃষ্ণ এর পর কি ক'রলো। কৃষ্ণ নিশ্চিত যে অতীনের পরামর্শ তার কাজে লাগবে না। তাকে স্ট্যাটাস বাড়াতে হবে। তার বন্ধু শংকর কোলকাতায় কাজ ক'রছে না? সে চায় না যে তার ছেলেমেয়েরা তার মতো হতভাগ্য জীবন যাপন করুক। অনেক দিক চিন্তা ক'রে সে ইলামবাজার পাবলিক লাইব্রেরীতে বদলি নেবার জন্য দরখাস্ত ক'রেছে। ওই লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান আর ইউনিয়নের অ্যাক লিডার মানববাবু তাকে চিঠি দিয়েছিলেন যে সে ওই লাইব্রেরীতে যেতে রাজি কিনা। জয়দেব ইলামবাজার থেকে খুব দূরে নয়। সে মাঝে মাঝে বাসে জয়দেব যেতে পারবে। রাস্তার যোগাযোগ আছে। ঘর ভাড়া ওখানে অতো বেশি নয়। ব্লক অফিস, ইস্কুল আছে। জিনিসপত্র তরিতরকারি কেনার জন্য তাকে সপ্তাহে অ্যাকদিনের হাটের অপেক্ষা ক'রতে হবে না।

জমি নিয়ে বড়ো সমস্যা। কৃষ্ণর তিন বর্গাদার তাদের হাতের সাত বিঘে জমি কিনবে। অবশ্য বাজারের প্রায় অর্ধেক দামে। সে নিজের আট বিঘের চার বিঘে তুষার ঘোষকে, দু' বিঘে মাণিক সাধুকে আর দু' বিঘে রেহেনালিকে বিক্রি ক'রবে। শেষ দু'জনের সঙ্গে সে কথাবার্তা পাকা ক'রে নেবে, শুধু তুষার ঘোষ ইতস্তত ক'রছিলো। কৃষ্ণ তাকে ব'লেছে,—'তোমার তিন বিঘের পাশাপাশি চার বিঘে পেয়ে যাবে। সাত বিঘে অ্যাক সাথে। তোমার সুবিধে হবে।' খরা-চাষের

সময়ে কৃষ্ণের জ্যাঠামশাইকে ওই চার বিঘের উপর দিয়ে ক্যানেলের জল নিয়ে যেতে হয়। হ্যাঁ, ওই জমিটা সে তার জ্যাঠার ঘোর শত্রু তুষার ঘোষকেই দেবে। খুব গোপনে।

সে ইলামবাজার ব্লক অফিসের মাসিক কর্মবিবরণীতে এক্সটেনশন অফিসারের সই করাতে নিয়ে গিয়েছে। লাইব্রেরীয়ানকে ও অনুরোধ করেছিলো,—'ইলামবাজারে আমার অ্যাকটা কাজ আছে। এবার আমাকে যদি যেতে দেন, খুব ভালো হয়।' অফিসের কাজ সারার পর ও মানববাবুর কাছে যায়। লোকাল লাইব্রেরী অথরিটির মিটিং শ্বার তার বদলির কি হলো জানা দরকার। মানববাবু জানালেন যে তাকে সিউড়ির রবীন্দ্র পাঠাগারে বদলি করা হ'য়েছে। হতভম্ব হয়ে সে জিগগ্যেস করে,—'তা কি ক'রে হয়? আমি ইলামবাজার লাইব্রেরীর জন্য দরখাস্ত করলাম'···শেষ পর্যন্ত সে জানলো, রবীন্দ্র পাঠাগারে বদলি চেয়ে করা তার দরখাস্তটা অফিস খুঁজে পেয়েছিলো, ইলামবাজারেরটা নয়।

তাকে অ্যাক আত্মীয়ের বাড়িতে রাত কাটাতে হয়। ঝুরকুনি যেতে হাঁটা পথটায় ছিনতাই-এর ভয়। অ্যাকরাশ তিক্ততা নিয়ে পরদিন সকালে সে বাড়িতে রওনা দ্যায়। আসার পথে ভাবে ওই বদলির আদেশের চিঠি সে নেবে না আর পদ্মপুর লাইব্রেরীতে থাকতে চায় এই ব'লে সে দরখাস্ত ক'রবে।

বাড়ি পৌঁছতেই ওর মা ওকে বলে আগের রাতে অ্যাকটা খাসি চুরি হ'য়ে গিয়েছে। গাঁয়ের অ্যাকজন তার জ্যাঠার ছেলেকে সুখবাজারের গরু ছাগলের হাটে টাকা গুণতে দেখেছে। কৃষ্ণ আগের রাতে বাড়ির বাইরে ছিলো, ও ব্যাটা সেই সুযোগ নিয়েছে। শ্যামা ডোম সেদিন তাকে গালাগাল ক'রতে ক'রতে গাঁয়ে ঘুরছিলো। হতে পারে ওর জ্যাঠামশাই আর তার ছেলের কানে সেটা গিয়েছে। দু' মাস পরে ওরা শোধ তুললো। সে পরের দিন জেলা সদর অফিসে গিয়ে বিনা দ্বিধায় বদলির অর্ডার নেয়। জমি-জমা বিক্রি করে টাকাটা ব্যাঙ্কে

রাখবে, সে ভাবে। পরে ব্যবসায় লাগাবে। রবীন্দ্র পাঠাগারে বদলির জন্য সে যখন দরখাস্ত করে, ওই লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান তাকে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছিলো। তার জামাইবাবু সিউড়িতে থাকে। তারাও সাহায্য ক'রবে।

. সদর অফিস থেকে কৃষ্ণ তার চার বিঘের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলো। মাঠের দিকে তার চোখ পড়ে। যতো দূর চোখ যায় মাঠ ফসলে ভরা। দেখে ভাবতে মন চায় না যে এদেশের অ্যাতো অভাব।

ধান খেতের তাজা সবুজ রঙ চ'লে গিয়ে সোনালী-হলুদ ছ্যাখা দিচ্ছে। যেনো অ্যাক শিশু-শিল্পী অনেক পরিমাণ হলুদ আর সবুজ রঙ পেয়ে খেলাচ্ছলে তুলি বুলিয়েছে। তার চোখ আরো কাছাকাছি জায়গায় পড়ে। আঁটিগুলো আলাদা আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে। কৃষ্ণ আদর ভরে অ্যাক গোছা হাতে নেয়, আঙুল দিয়ে গিবে ছ্যাখে। ধানের ভিতরের দুধ জমাট হ'য়ে আসছে। নরম রোদ আর বাতাসের ঠাণ্ডা যেনো ধানের কর্কশ গায়ের উপর জমাট বেঁধেছে। সে তার দু' বছরের ছেলের রুক্ষ, গ্রাম্য স্পর্শ অনুভব করে।

অ্যাক মাসের মধ্যে ফসল তার ছোট্ট উঠোনে উঠবে। তাকে এসব ছেড়ে যেতে হবে। তার বাপ-ঠাকুর্দা এই জমিতে চ'লেছে ফিরেছে, ক্যামন ক'রে সে সব ছেড়ে যাবে। জমি বিক্রির জন্য সে দরকষাকষি ক'রেছে। ক্যামন ক'রে সে শ্যামা ডোম, বুড়ো অনাথ বাউরির সঙ্গে মজা করার কথা ভুলবে? সিউড়িতে জেলাশহরে তাকে ভিন দেশির মতো থাকতে হবে। হঠাৎ তার মনে হয় শ্যামা ডোমের অভিশাপ ফলছে কি না।

৮

নবীন মিনতিকে ভুলতে চেষ্টা করে, কিন্তু কৃষ্ণ মনে পড়িয়ে ছ্যায়। সে কৃষ্ণর কাছ থেকে শোনে মিনতির স্বামীর গুরুতর অসুখ। টিউমার

বিম্বা ব্যানার্জি। বুদ্ধু আকোনায় ধার দেওয়া টাকা আদায় ক'রতে গিয়েছিলো। মিনতির বাড়িতে ওকে চেনে। ও সেখানেও গিয়েছিলো।

নবীন অ্যাকবার ভাবে সে এই নিয়ে মাথা ঘামাবে না। সে শিল্পী। তার নৈর্ব্যক্তিক হওয়া উচিত। কিন্তু মিনতির কষ্ট দেখে কি ক'রে ও মুখ ফিরিয়ে থাকবে। সে যে অ্যাক সময়ে ওকে ভালোবেসেছে। তার গুরু প্রেমদাস ব'লেছিলো,—'এই দেহ মাটির ভাণ্ড সব সাধনার মূল।' সে মিনতিকে নিয়ে সোনামুখী গাঁয়ে চ'লে যেতে পারতো। মেয়েটা যে খুব ভীতু।

মিনতিকে নিয়ে ছলনা-বঞ্চনা করা মানে প্রতিমার সঙ্গে বেইমানি করা। এতে মিনতির ভালো হবে না, কিন্তু প্রতিমা তার বিষণ্ণ মুখ দেখলে কষ্ট পাবে, উদ্বিগ্ন হবে।

কৃষ্ণ বলে,—'নবীন, আমি যাচ্ছি। ওরা আমাকে সিউড়িতে দিলো। অ্যামন হবে, আমি ভাবতে পারি নি।' নবীন বলে,—'আমি ভালো নাই। তো-তু অ্যাতো ক'রে বদলি চাইছিলি, তু পেয়েছিস। যখন সময় পাবি, আসবি।

কৃষ্ণ উদ্বিগ্ন। ওর আদরের মেয়ে শহরে গেলে টেলিভিশনের জন্য হয়তো জ্বালাতন শুরু ক'রবে। ওর ছেলেকে কিণ্ডার গার্ডেনে ভর্তি করবে মনে ক'রেছিলো, কিন্তু পরবর্তী ফল সম্পর্কে ওকে ভাবতে হচ্ছে। ওরা ছাত্রদের অতিরিক্ত স্মার্ট আর উচ্চাকিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করে ত্যায়। ওদের মাসিক চাহিদা তার পক্ষে খুব বেশি। কৃষ্ণ নবীনের সঙ্গে এসব আলোচনা ক'রেছে। নবীন তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ক'রে বলেছিলো,—'কৃষ্ণ, তুই অ্যাবা ঝামেলায় পড়িস নি। আমরা ভাবি, ভারতের যতো লোক বিদেশে আছে, তারা সুখী। এই কথা সত্যি নয়। অতীনদা সেদিন মনোজ ভৌমিকের লেখা 'এই দ্বীপ এই নির্বাসন বইটার নাম করছিলো। অহনীশ-সুলেখা আমেরিকায় থাকে। তাদের ছেলে দীপঙ্কর। ও এই সমস্যার কারণ। সে নিজের জন্য মোটর গাড়ি চাইছিলো। তার আমেরিকান বন্ধুদের অনেকের নিজেদের গাড়ি

আছে। গাড়ি ছাড়া ওদের সাথ দেওয়া যায় না। অবনীশ তার ছেলের দাবি মেটাতে পারে নি কো।'

কৃষ্ণ ওখানে আধঘণ্টারও বেশি সময় ছিলো। চা খেয়ে সে চ'লে আসে। নবীনের মনে হয় এই সমাজ, দেশটা তার শাসকরা যন্ত্র। না, বুলডেজার। বছরের পর বছর তার উপর রক্ত জমে অ্যামন হলো। ম'রচের সঙ্গে আলাদা ক'রে তাকে চেনা যায় না।

প্রতিমা বাইরে আসছিলো। সে বলে,—'কি ক'রছো? অ্যাকবার যাও না। পঞ্চাশ তেল এনে দাও।' নবীন 'সবখানে ম'রচে প'ড়েছে ব'লে উঠে পড়ে। প্রতিমা শুনতে পায়, বলে,—'কি ব'লছো? সব সময় ফক্কড়ি ভালো লাগে না কো।' নবীন জবাব দ্যায়,—'বলছিলাম কি তোমার জিবের ধারে সব মরচে পরিষ্কার হয়ে যাবে? 'প্রতিমা আড়চোখে এদিক ওদিকে চেয়ে দ্যাখে কেউ নেই। ও নবীনকে 'পাজি' বলে চিমটি কাটতে ছোটে। সে তৎক্ষণে পালিয়েছে।

৯

আমি জয়দেব-এ অনির্বাণ মিত্রের ঘরে ব'সেছিলাম। ক্যাসেট প্লেয়ারে নবীনের গান বাজছিলো,—

'দেখলাম রে তোর মর্দানী
নিজের জমি পরকে দিয়ে
করিস কিষাণি।'

নবীনও ক্যাসেটে বন্দী নিজের কণ্ঠস্বর শুনছিলো। অনির্বাণ ঘরের অ্যাক কোণায় ব'সে ছিলো, কম কথা ব'লছিলো। তার স্ত্রী ওখানে ছিলো না।

জয়দেব মেলা অ্যাকদিন আগে শেষ হ'য়েছে। যেখান থেকে শুরু ক'রেছিলাম, তার অ্যাক বছর পরের ঘটনা। আকাশে মেঘ। সারাদিন বৃষ্টি। বিকেলে ঘণ্টা খানেক আগে থেমেছে। বাইরে যেতে আমাদের আলসেমি লাগছিলো।

হঠাৎ কৃষ্ণের প্রবেশ। আমি অ্যাতোটা উত্তেজিত যে উঠে প'ড়লাম। এই পর্যন্ত আমি বিস্তৃত বিবরণ শুনেছি, নবীন-কৃষ্ণ-অতীনদের চিনেছি, কিন্তু নিজের চোখে কিন্তু দেখি নি। অনুমান ক'রলাম আমার সামনেই কিছু ঘটতে চ'লেছে।

কৃষ্ণর গলার স্বর স্বাভাবিক নয়। নবীন জিগগ্যেস করে,—'কি খবর?' অনির্বাণ ওকে গামছা এগিয়ে দিয়ে ব'সতে ব'ললো। কৃষ্ণ রুমাল বের ক'রে গা মুছলো। মুখে ব'ললো,—'আমি গামছা ছোঁবো না। শ্মশান থেকে আসছি।' মিনতির স্বামী আজ সকালে মারা গিয়েছে। 'রুমাল পকেটে রেখে সে বলে,—'আমি জানতাম না। আমি ঝুরকুনি এসছিলাম, নিয়ে অ্যাকোনা গিয়েছিলাম ধারের টাকা আদায় ক'রতে। বদমাস লোকটা কিছুতেই টাকা দিচ্ছে না।' কৃষ্ণ ঠাণ্ডায় কাঁপছিলো। অনির্বাণ ব'ললো,—'আগে বসো। অন্ততঃ অ্যাক কাপ চা খাও।'

বেদনাদায়ক ঘটনা। নবীন শুধু ব'ললো,—'ওঃ! খুব ঠাণ্ডা।' কৃষ্ণ ব'লে চ'লেছিলো,— মিনতির ভাইগুলো থাকলো। ব্যাটা শুয়োর। ওরা নবীনের ব্যাপাটাকে কায়দা ক'রে চাপা দিয়েছিলো, অ্যাকোনায় পৌঁছয় নি। ওরা মিনতিকে জোর ক'রে অধিক মাঝবয়সী বড়ো লোকের সাথে বিয়ে দিয়েছিলো। ধান্ধা ছিলো। ওর কাছ থেকে মাঝে মাঝে বেশ টাকা হাতাতে পারে। লোকটাকে আমি প্রায় দশ বছর দেখছি। ওর সেই থেকে অসুখ।' নবীনের শান্তি কোথায়। মৃত্যুর পরে? সে ভাবে। বাউলদের প্রথা অনুযায়ী তাকে মরার পরে সমাধিস্থ করা হবে। মাটির নিচে কী অন্ধকার কী ঠাণ্ডা! ও উষ্ণতা চায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা অজয়ের চরে শ্মশানে পৌঁছলাম। রাত নেমেছে। সম্ভবতঃ বিদ্যুৎ নেই। তিনটে চিতা জ্বলছিলো। কৃষ্ণর সঙ্গে নবীন আর আমাদের দলটা অ্যাকটার কাছে পৌঁছলো। দুর্গাপুরের আলো এবং ভাঙ্গা মেলা থেকে ভেসে আসা বিক্ষিপ্ত স্বর ভিন্ন

জগতের হুই হট্টগোলের মতো কানে আসছিলো।

চিতা ধিকিধিকি জ্বলছিলো। শিখাহীন। ঘণ্টা চারেক আগুন দেওয়া হ'য়েছিলো। অনির্বাণ নবীনের সামনে দাঁড়িয়ে। গভীর কালো আকাশের পেক্ষাপটে অনির্বাণের মুখচ্ছবি।চিতার অস্পষ্ট আলোয় ছ্যাখা যাচ্ছিলো। নবীন ওই দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে যেনো ওটাই ওর কাছে বাস্তব সত্য।

## শচীন হালদার

মন্দির বাজার জুনিয়র হাই স্কুলের কেরাণির পদের জন্য ইণ্টারভিউ চ'লছে। 'শচীন হালদার'—ইণ্টারভিউ-এর কামরা থেকে থমথমে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। এটা তার জীবনের দ্বিতীয় ইণ্টারভিউ।

শচীন—স্যার, আসতে পারি?

প্রথম পরীক্ষক—আসুন।

দ্বিতীয়—বসুন।

তৃতীয়—আপনার নাম?

—শচীন হালদার।

চতুর্থ—আপনার বাড়ি কোথায়?

—আমার বাড়ি আঁকড়াবেড়ে।

দ্বিতীয়—আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা?

—বি. এ.।

প্রথম—সাবজেক্ট?

—বাংলা, ইতিহাস, আর ফিলসফি।

তৃতীয়—আপনার হবি?

চতুর্থ পরীক্ষক তাকে প্রায় উত্তর দেবার সময় না দিয়ে জিগগ্যেস করেন,—'এটা বিজ্ঞানের যুগ। এতে আপনার আগ্রহ নেই?'

শচীন আত্মবিশ্বাস এনে বলে,—'হ্যাঁ স্যার, আমি—আমরা গাঁয়ের লোকেরা—

প্রথম—'সংক্ষেপে বলুন।'

শচীন—প্রাইভেট পড়িয়ে তার হাত খরচ জোগাড় করে। ঘরের কাজেও সে কিছুটা সময় ছায়। অ্যাকবার তার জ্যাঠামশাই তাকে সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কয়েকটা বই উপহার দিয়েছিলেন। স্কুলের ছাত্র থাকার কালে সে ওগুলো পড়েছিলো। পরে সে ওসব পড়ার সময়

পায়নি, সেই মানসিককাও তার ছিলো না।

চতুর্থ,—'থার্মোডায়নামিকসে'র প্রথম সূত্রটা কি? অল্প কথায় বলুন।

অ্যাক মুহূর্ত ইতস্তত করে শচীন অসহায় ভাবে বলে,—'এটা আমার সাবজেক্টের বাইরে স্যার।' প্রথম পরীক্ষক তার শংসাপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র দেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলেন,—'আচ্ছা, আসুন।'

শচীন বুঝতে পারে এ হলো তাকে বাতিল করে অ্যাকটা কায়দা। বেরিয়ে আসতেই অ্যাক ভদ্রলোক তাকে হাত নেড়ে ডাকেন,—'আপনি শচীন হালদার?'

—'হ্যাঁ, স্যার।'

—'আমাদের স্কুলের জন্য কিছু দিতে হবে। এ-ই দান হিসাবে। বেশি নয়, হাজার পাঁচেক।'

শচীনের কাছে এসব খুব অ্যাকটা অপ্রত্যাশিত নয়। তার বাবা তাকে সাত হাজার পর্যন্ত দেবেন বলে দিয়েছিলেন। শচীন মানুষটির দিকে আর অ্যাকবার তাকায়। মাথার চুল কাঁচায় পাকায় মেশানো হলেও শক্ত-সমর্থ, চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ। পরনে বেশ দামী ধুতি-পাঞ্জাবি। উনি শচীনকে চেনেন না কিন্তু শচীন ওঁকে চেনে। তিনি ওই স্কুলের সেক্রেটারির ভাই ও স্কুলের শিক্ষক।

শচীন পরিষ্কার বোঝে ওই টাকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বড়ো জোর স্কুলের জন্য ব্যয় হবে, বাকিটা এদের পকেটে যাবে। সে কোনো উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে আসে।

## ২

শচীন ব্যবসায়ে নামার সিদ্ধান্ত নেয়। সে বাবার ষষ্ঠ সন্তান। বাবার কাছ থেকে বংশগত ভাবে অ্যাক গুঁয়েমি পেয়েছে। তার বাবা কেশব হালদার আগেকার দিনের ম্যাট্রিক পাশ। সে মুখে আদর্শের কথা বলে কিন্তু জানে যে সম্পত্তি আর প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে হলে

আজকের পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।

কেশব হালদার ষাট বিঘে জমির মালিক। দিনে দিনে জমি রাখা মুশকিল হ'য়ে পড়ছে। সেইজন্য সে চায় না যে সন্তানরা জমি আর চাষের উপর নির্ভর করুক। শচীনের জ্যাঠামশাই ভালো ছাত্র ছিলেন, স্থানীয় এলাকা সমাজসেবী হিসাবে তাঁর নাম ছিলো। ঠিক মতো যোগাযোগ পেয়ে যাওয়ায় তিনি আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। শচীনের দাদারা প্রতিষ্ঠিত, দুই দিদির ভালো ঘরে বিয়ে হয়েছে। অ্যাক দিদির নিকটাত্মীয় এম. এল. এ.। সুতরাং কেশব হালদার বংশ-মর্যাদার সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। সে ছোটোখাটো ব্যবসায়ে নামার অ্যাকেবারে বিপক্ষে। বেশ সম্মান যেনো থাকে এইভাবে শুরু করা উচিত, এই হলো তার মত। ষাট বিঘে জমির মালিক মধ্যবিত্ত চাষী সংসার ভালো ভাবে চালাতে পারে কিন্তু বড়ো ব্যবসায়ে নামার মতো পুঁজি সে কোথায় পাবে।

কেশব হালদার নিজে সেক্রেটারির কাছে গিয়ে টাকা নিতে বলতে ইতস্ততঃ করছিলো। সে শচীনকেই টাকা দেবার প্রস্তাব করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলো। ইন্টারভিউ-এর পরে কোনো খবর না পেয়ে সে ছেলেকে সন্দেহ করে। সে নিজের ছেলেকে ভালো করে জানে। শচীন মায়ের মাধ্যমে বাবার কাছে দু'হাজার টাকা চায়, কিন্তু কেশব হালদার বিরক্ত। তার মন্তব্য শচীনের কানে আসে। সে নিশ্চিত যে তার বাবা তাকে শোনাবার জন্যই কথাগুলো বললো,—'কোন বন্ধুতে ওর মাথায় বুদ্ধি দিলো ফুটে বসে কারবার করো। হ্যাঁ, বাবু ফুটে বসবেন। বন্ধুরা ওঁর পয়সায় ফুর্তি মারবে আর কেটে পড়বে। বংশের নাম ক্যানো না ডুবোবে।' শচীন বোঝে মদো মাতাল বলাইকে লক্ষ করে বাবা কথাটা বলছে। কিন্তু অ্যাক বছর আগে টিউশনি শুরু করার পর সে এই সঙ্গ ছেড়েছে। বাবা সেটা স্বীকার করে না। শচীনের রোখ-চাপে কিন্তু সেটা সে প্রকাশ করে না। যদি বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা পায় এই সুযোগ সে খোঁজে। কিছুদিনের মধ্যেই সে

নিশ্চিত হয় যে বাবা তাকে টাকা দেবে না। দেবার ইচ্ছা থাকলে আগেই দিতো।

শেষবারের মতো বাপ ছেলেকে বোঝাবার চেষ্টা করে,—'লক্ষ্মীকান্ত-পুর রোডের ধারে এই চোখের সামনে বসবে তো লোকে কি বলবে?' কেশব হালদার ছেলেকে তুই বলে ডাকে। এবার সে 'তুমি সম্বোধন করলো।' তার বাবার মেজাজ গরম হয়েছে। শচীনও শক্ত ভাবে বলে —'লক্ষ্মীকান্তপুর বাজারে কে কাকে চিনছে? ওখানে যায়া তোমাকে চেনে যারা চেনে না সব সমান। তারা আমাকে ভাত দেবে না। ওদের কথা শুনে লাভ নাই। যে টাকা বাইরের লোককে দেবে সেই টাকায় ব্যবসা করা হবে।' কেশব হালদার চিৎকার করে, —'ছেলে হয়ে বাপকে উপদেশ দিতে এয়েছে। টাকা আমি দেবো, আমি বুঝে নোবো। লাট সাহেবের বে—টা, ঘরে বসে ভাত মারছো, যাবে বাপের যাবে। ক'দিন ব্যবসা মেইরেছো?

শচীন নিজেকে সামলাতে না পেরে বাবার দুর্বল জায়গায় ঘা দ্যায়, —'ব্যবসা করলে তোমার সম্মান যায়, দু'নম্বরী করে চাকরি পেতে তোমার সম্মান যায় না?

সে দৃঢ় ভাবে নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করার সিদ্ধান্ত নেয়। বংশের সম্মানকেই সে জলাঞ্জলি দেবে। সে ঘাড়ে ঝালমুড়ির টিন ঝুলিয়ে ট্রেনে হকারি করে বেড়াবে। শ'তিনেক টাকা হলেই শুরু করা যাবে। বেশ লাভ থাকে। শচীন খানিকটা তৃপ্তি অনুভব করে। কিন্তু ওই অল্প পুঁজিই বা কোথায়? জিনিস পত্র রাখার আর থাকার জন্য ঘর ভাঁড়া করতে হবে। ঝালমুড়ি ব্যবসা শুরু করলে সে আর আর বাড়িতে থাকতে পারবে না। কোথাও অন্তত যদি আশ্রয় পায় তাহলে সে পারবে। কী সমস্যা!

প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হলে অন্তত সোজা হয়ে দাঁড়াবার মতো মাটি দরকার। শচীনের বন্ধু প্রবোধ মণ্ডল ও ঝাল-মুড়িওয়ালা অতুল হালদার তাকে সাহায্য করে। অতুলকে শচীন

কাকা বলে ডাকে।

প্রবোধ মণ্ডলের বাবা জয়নগরে বেশ কয়েকটা ছোটো ছোটো ঘরের মালিক। ভাড়া দেবার জন্য এগুলো তৈরি। প্রবোধ ওখানেই থাকে। প্রবোধদের বাড়ি লক্ষ্মীকান্তপুরে—আঁকড়াবেড়ে থেকে কাছেই।

সে ঘরগুলোর ছ্যাখাশুনো করে। শচীন ওর কাছে ঋণ-স্বরূপ কিছু টাকা পায়। ব্রিটানিয়া বিস্কুটের টিনে ছোটো ছোটো টিনের কৌটো রাংঝাল দিয়ে জুড়ে ঝালমুড়ির টিন তৈরি হলো। শচীন নিজের টাকা থেকে ছোলা আর মটর কলাই ভিজিয়ে রাখবার হাঁড়ি, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ কাটার ছুরি ইত্যাদি কেনে। প্রবোধ তাকে আশ্বাস ছ্যায়,—'তোর কথা চারদিকে বললে আমাকে কেউ দশটা পয়সা দেবে না। যেখানে পয়সা নেই সেখানে প্রবোধ মণ্ডল পা ছ্যায় না। আমি আর কাউকে ভাড়া দিতাম। না হয় আমি তোকে দিলাম।' অতুল কাকা উৎসাহ ছ্যায়,—'আমি এই শালো বলে বলছি। কোন শালো বারকার নোককে বলে। আমি তোমাকে বাপ এই নাইনে নে এলাম, আমি তোমার ক্ষেতি করবো।'

৩

এই লাইনে আজ শচীনের প্রথম দিন। অতুলকাকার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনার পর সে স্থির করে যে তার জিনিসপত্র সে ভাড়ার ঘরে রাখবে আর হকারের কাজ চালাবে। লাভ-লোকসানের হিসাবটা পাওয়া দরকার। সে মাস দুয়েকের জন্য কোলকাতায় কোনো কাজে যাচ্ছে বাবাকে এই রকম বললে ভালো হবে। দু'অ্যাক মাস পরে ও যখন এই কাজে অভ্যস্ত হবে তখন আরও দূরে কোথাও সে ঘর ভাড়া নেবে। যতো কোলকাতার দিকে যাওয়া যাবে ততোই তো ঘর ভাড়া বেশি হবে। তাই ও চেষ্টা পরে করাই ভালো। প্রথম প্রথম খুব চেষ্টা ক'রতে হবে যাতে এসব কথা তার বাড়ির লোক জানতে না পারে। কিন্তু কাজটা খুবই কঠিন কারণ লক্ষ্মীকান্তপুরই

শুধু নয় আঁকড়াবেড়েরও কিছু লোক কোলকাতা যাতায়াত করে। পারলে ও মালপত্র জয়নগরে রেখে খাওয়া-দাওয়ার কাজ অ্যাক-আধ মাস বাড়িতেই চালাবে। প্রথম প্রথম থাকা খাওয়া দুয়ের খরচ তোলা কঠিন।

সকালবেলা। অ্যাকটা লোকাল ট্রেনের আসার সময় হয়ে গিয়েছে। ভিড় বাড়ছে। লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনের প্লাটফর্মে নানাধরণের হকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। টিনের শেডের শেষদিকে শচীন অতুলকাকার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে টিন। শচীন অ্যামন ভাবে দাঁড়িয়েছে যাতে সহজে পরিচিত কারো চোখে না পড়ে। তাদের পিছনেই স্টেশনের বেড়া।

সকালের লোকাল ট্রেন থেকে শুরু করাই ভালো কারণ স্কুল, কলেজের ছেলেমেয়ে, তার মাস্টার, বন্ধুরা পরের ট্রেনগুলোয় যাতায়াত করে।

ট্রেন প্লাটফর্মে আসে। এইটাই শেষ স্টেশন। কিছুক্ষণ থামার পর ট্রেনটা কোলকাতার দিকে আবার দৌড়বে। সিট দখল করার জন্য যাত্রীদের মধ্যে বেশ হুড়োহুড়ি শুরু হলো। শচীন উদ্বিগ্ন ভাবে লক্ষ করে তাঁর ঠিক সামনের কামরাটাতে চেনা শোনা কেউ উঠছে কিনা। যাক, সেরকম কেউ উঠলো না। আরম্ভ তাহলে ভালোই। অতুলকা-ও নিশ্চয় এটাতে উঠবে।

ট্রেনের বাঁশি বাজে। অতুলকা কামরায় ওঠে, শচীন তার পিছন পিছন। অতুলকা তার কানে কানে বলে,—'ছচনে, তু আজকের দিনটা আমার সঙ্গে থাক। কাল পরশু থিকে তু নিজে পারবি। অন্য বগিতে যেতে লাগবি। নইলে আমার বিক্কিরি বাটা মার খাবে। শচীন লক্ষ করে অতুলকা 'তোমাকে বাপ'-এর বদলে ছচনে তু শুরু করেছে। সে 'ঝালমুড়ি' বলে হাঁকার চেষ্টা করে। তার গলা শুকিয়ে গিয়েছে, কণ্ঠস্বর বিকৃত শোনাচ্ছে। তার মনে হয় কামরার সব যাত্রীরা তার দিকে যেনো হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

সকালের দিকের ট্রেনে ঝালমুড়ির খদ্দের কম। অ্যাকজন শচীনের কাছ থেকে অ্যাক প্যাকেট ঝালমুড়ি কেনে। সম্ভবত লোকটা রাজমিস্ত্রি। সে জিগ্যেস করে,—এই লাইনে নোতুন? আগে তো দেখিনি।' শচীন বোঝে লোকটা সহানুভূতিতেই তার কাছে কিনলো। সে কোনো রকমে উত্তর দ্যায়—'হ্যাঁ।' লোকটা তাকে উৎসাহ দ্যায়, 'ঠিক আছে ভাই, চালাও। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে। আমাদেরও হতো।' শচীন মনে খানিকটা বল পায়। যাইহোক, সকলেই হাঁ করে তাকায় না।

কামরায় বেশ ভিড়। পীযূষের দিকে শচীনের চোখ পড়ে। পীযূষের বাড়ি বিষ্ণুপুর, আঁকড়াবেড়ে থেকে প্রায় চার কিলোমিটার। প্রাইমারি স্কুলে সে শচীনের সঙ্গে পড়তো। অ্যাখন বোধহয় সরকারি চাকরি করে। শচীনকে দেখতে না পাবার ভান করে পীযূষ মুখ ফেরায়। এতে শচীনের সুবিধাই হলো। পীযূষ কথা বললে তার অস্বস্তি হতো। বাধা পড়লো তাই পরের স্টেশন মথুরাপুর থেকে সে শুরু করবে। শচীন ভাবে মথুরাপুরের পরের স্টেশন জয়নগর থেকে শুরু করা ভালো। ওই স্টেশনের পরে চেনাশোনা লোকের সঙ্গে ওর মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা কম। এতে বাপ-মা আর আত্মীয় স্বজনের কান আড়াল করারও সুবিধা। সে প্রথমে কথাটা ভাবেনি। অতুলকা হকারদের নেতা জয়দেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে শচীনের হকারি করার কথা ঠিক করে দিয়েছে। জয়নগর থেকে শুরু করলে তাকে ওদিকে দু'তিনটে স্টেশন এগিয়ে নিতে হবে। তাহলেই তো ওদিকের হকাররা গালাগালি দেবে, মারধোরও করতে পারে। সে বুঝতে পারে, পথে যখন সে নেমেছে অ্যাখন আর কেউই তার পাশে দাঁড়াবে না। অতুলকা-ও অ্যাখন তার প্রতিযোগী।

মথুরাপুরে কামরা পরিবর্তন করতেই অ্যাক দল মেয়ের দিকে তার চোখ পড়ে। এরা মথুরাপুরেই উঠলো। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিলো, অন্য কামরায় যাওয়ার সুযোগ শচীন পায়নি। তাকে তো অ্যাক কামরা

থেকে নেমে ওই কামরায় যেতে হয়েছে।

মেয়েগুলো প্রাইভেট মাস্টারের কাছে পড়তে গিয়েছিলো হবে। ওরা কেউ কেউ শচীনকে চেনে। কলেজে পড়ার সময়ে শচীন এদের বেশ উৎপাত করতো। স্বভাবত শচীনের আশঙ্কা হয় এবার ওরা যদি ওকে বিদ্রূপ করে।

কামরাটায় ভিড় কম ছিলো। শচীন ধপ করে অ্যাকটা সিটে বসে পড়ে। তার একটু স্বস্তির দরকার। জয়নগরে অতুলকা ওই ওই কামরায় ওঠে। সে বলে বসে,—'হেই ওঠ! নজ্জা করলে প্যাটের ভাত জুটবে না। তু বেচা কেনা করবি ইদিকে, আমি উদিকে। ঘাবড়া বিনি খবরদার।'

শচীন লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায়। তার মনে হয় যেটাকে সে পায়ের তলার মাটি মনে করেছিলো সেটা মাটি নয়। রেলের চাকার নির্বিকার খটাখট শব্দ শুধু কানে আসে। অনেকগুলো ভাবনা তাকে ধাঁধায় ফেলে ছায়। কোনটা তার সমাধান? আত্মহত্যা বাইরের কথা দূরে থাক, নিজের কাছেই নিজেকে বড়ো ছোটো মনে হয়। আত্মহত্যা মানে হেরে যাওয়া। তাতে কেশব হালদারকে মুখের মতো জবাব দেওয়া হয় কই?